ইসলামী জাগরণের তিন পথিকৃৎ

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

ইসলামী জাগরণের তিন পথিকৃৎ

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

বিংশ শতাব্দীতে ইসলামী জাগরণের জন্য যাঁরা বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হচ্ছেন শায়খ হাসানুল বান্না (রহ), বাদীউয্ যামান সাঈদ নুরসী (রহ) ও সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ)। নাস্তিকতাবাদ, অংশীবাদ ও ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদ-সৃষ্ট তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি দূরকরণে তাঁরা মূল্যবান অবদান রেখেছেন। সৃষ্টি করেছেন ইসলামী জাগরণ।

ইউরো-এমেরিকান জীবন দর্শনে বিশ্বাসী শাসকগোষ্ঠী তাঁদেরকে স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি। বারবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে তাঁদের চলার পথে। বারবার তাঁদেরকে পাঠানো হয়েছে কারাগারে।

আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল রেখে, উচ্চমানের ছবর অবলম্বন করে, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তাঁরা প্রতিটি বাধার মুকাবিলা করেছেন অকুতোভয় বীরের মতো।

তাঁরা ছিলেন ইসলামী জাগরণের পথিকৃৎ। তাঁদের জীবন থেকে অনেক কিছু শেখার রয়েছে আমাদের। তাঁদের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো অতিসংক্ষেপে এই বইতে তুলে ধরেছি সম্মানিত পাঠকদের জন্য।

একবিংশ শতাব্দীতে যারা ইসলামের বিজয় প্রত্যাশী তাদের জন্য মূল্যবান পাথেয় রয়েছে এই তিনজন মহা নায়কের অনুসৃত কর্ম-কৌশলে।

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

সূচীপত্র

- শায়খ হাসানুল বান্না (রহ) ॥ ৭
- বাদীউয্ যামান সাঈদ নুরসী (রহ) ॥ ২৩
- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) ॥ ৫১

بسم الله الرحمن الرحيم

শায়খ হাসানুল বান্না (রহ)

জন্ম

১৯০৬ সনে শায়খ হাসানুল বান্না মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আব্বা আবদুর রাহমান আল বান্না একজন উঁচু মানের ইসলামী ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

শিক্ষা জীবন

আট বছর বয়সে শায়খ হাসানুল বান্নার আনুষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন শুরু হয় মাদরাসা আর রাশাদ আদ দীনিয়াহ নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। একই সাথে তিনি আল কুরআন হিফয করতে থাকেন।

কিছুকাল পর তিনি মাহমুদিয়ার মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র হন। বছর খানেকের মধ্যেই শায়খ হাসানুল বান্না দামানহুর টিচার্স ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি হবার সুযোগ পান। এই স্কুলে লেখাপড়া কালে তিনি দামানহুরের বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিদের নিকট যাতায়াত করতেন। তাঁদের কাছ থেকে তিনি দীনের তালিম হাছিল করতেন। এই সময় ব্যাপকভাবে ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের দিকেও তিনি মনোযোগ দেন।

টিচার্স ট্রেনিং ডিপ্লোমা পরীক্ষায় তিনি তাঁর স্কুলে প্রথম ও সারাদেশে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন।

অতপর কায়রোতে যান ও আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দারুল উলুমে ভর্তি হন। এই সময় তাঁর আব্বা সপরিবারে মাহমুদিয়া থেকে কায়রোতে স্থানান্তরিত হন।

কায়রোতে অবস্থানকালে শায়খ হাসানুল বান্না মিসরের অন্যতম সেরা ইসলামী ব্যক্তিত্ব শায়খ মাহমুদ কর্তৃক পরিচালিত জামিয়াতুল মাকারিমিল আখলাক আল ইসলামিয়াহ নামক সংস্থার সদস্য হন। এখানেই তাঁর আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার (সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ) তৎপরতার হাতেখড়ি।

১৯২৭ সনের জুলাই মাসে দারুল উলুম থেকে তিনি ডিপ্লোমা লাভ করেন। এখানেই তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

কর্মজীবন শুরু

১৯২৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে শায়খ হাসানুল বান্না সরকারী স্কুলের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। তাঁকে পোস্টিং দেয়া হয় ইসমাঈলিয়াতে।

ইসমাঈলিয়া সুয়েজখালের সাথে সংযুক্ত তিমসাহ ঝিলের সন্নিকটে অবস্থিত একটি শহর। স্কুলের শিক্ষক হিসেবে তিনি কর্তব্য পালন করতে থাকেন। আর সময় সুযোগ মতো তিনি নিকটবর্তী ক্লাব ও কফি হাউসে গিয়ে দীনী বক্তব্য পেশ করা শুরু করেন।

আল ইখওয়ানুল মুসলিমূন গঠন

শায়খ হাসানুল বান্নার সংক্ষিপ্ত অথচ জ্ঞানগর্ভ ইসলামী ভাষণ চিন্তাশীল লোকদেরকে প্রভাবিত করতে শুরু করে। ১৯২৮ সনের মার্চ মাসে ছয়জন ব্যক্তি তাঁর বাসায় আসেন তাঁর সাথে আলাপ করতে।

শায়খ হাসানুল বান্না তাঁদের সামনে তাঁর চিন্তাধারা পেশ করেন এবং সমাজ অংগনের সর্বত্র ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগঠিত প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে।

এই মিটিংয়ে আগত ছয়জন ব্যক্তি হচ্ছেন-

(১) হাফিয আবদুল হামীদ, (২) আহমাদ আল হাসরী, (৩) ফুয়াদ ইবরাহীম, (৪) আবদুর রাহমান হাসবুল্লাহ, (৫) ইসমাইল ইযয ও (৬) যাকী আল মাগরিবী।

শায়খ হাসানুল বান্না চাইলে তখনই আরো অনেককে ডেকে নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রতিটি গঠনমূলক আন্দোলনের শুরুতে থাকেন মাত্র একজন লোক। তারপর আরো কিছু সংখ্যক সমমনা লোক যুক্ত হয়ে সংগঠিত তৎপরতা শুরু করেন। গোড়ার দিক কার এই ব্যক্তিদের চিন্তার ঐক্য সংগঠনের ভিতকে দৃঢ়তা দান করে। তাঁদের অভিন্ন বক্তব্য পরবর্তীতে যারা সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয় তাদের চিন্তার ঐক্য নিশ্চিত করে। আর চিন্তার ঐক্যই যদি না থাকে একটি প্লাট ফরমে অসংখ্য লোকের ভীড় জমিয়েও কোন সুফল আশা করা যায় না।

আলোচনান্তে একটি সংগঠন কায়েমের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংগঠনের নাম রাখা হয় আল ইখওয়ানুল মুসলিমূন। আর এর আলমুরশিদুল আম নির্বাচিত হন শায়খ হাসানুল বান্না। এইভাবে ১৯২৮ সনের মার্চ মাসে মিসরের অন্যতম শহর ইসমাঈলিয়াতে সাতজন সদস্য নিয়ে আল ইখওয়ানুল মুসলিমূন গঠিত হয়। উল্লেখ্য যে তখন শায়খ হাসানুল বান্না ছিলেন ২২ বছরের একজন দীপ্তিমান যুবক।

শায়খ হাসানুল বান্না ভালো করেই জানতেন যে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল জিহাদু ফিল ইসলাম বা ইসলামী আন্দোলনের প্রধান কাজ হচ্ছে আদ্‌দাওয়াতু ইলাল্লাহ বা আল্লাহর দিকে লোকদেরকে ডাকা। এই কাজ করতে হলে লোকদের সামনে প্রথমেই তুলে ধরতে হয় আল্লাহর পরিচয়, তারপর আল্লাহর পথের তথা ইসলামের পরিচয়। এরপর তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হয় ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহর বিধান অনুসরণের সাথে সাথে সামষ্টিক জীবনে আল্লাহর বিধান কায়েম করার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করতে।

আল ইখওয়ানুল মুসলিমূনের সাংগঠনিক বিস্তৃতি

শায়খ হাসানুল বান্না ইসমাঈলিয়া শহর চষে বেড়াতে লাগলেন। তিনি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে লোকদের সাথে আলাপ করতেন ও ইসলামের আলো ছড়াতেন। এইভাবে কাজ চলে তিনটি বছর। বেশ কিছু লোক তাঁর ডাকে সাড়া দেয়।

আল ইখওয়ানের সদস্যগণ তাঁদের নেতার অনুকরণে লোকদের বাড়িতে বাড়িতে যেতেন। বিশিষ্ট সদস্যগণ মাসজিদে সমবেত লোকদের সামনে বক্তব্য পেশ করতেন। তাঁরা কফি-খানাতেও যেতেন। উপস্থিত লোকদেরকে নিজেদের বক্তব্য শুনাতেন। সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে তাঁরা যেতেন, তাদের সাথে মিশতেন, তাদের কথা শুনতেন ও তাদেরকে দীনের কথা শুনাতেন।

মাত্র চার বছরের মধ্যেই আল ইখওয়ান খুবই পরিচিত একটি সংগঠনে পরিণত হয়। ইসমাঈলিয়াতে অনেকগুলো শাখা কায়েম হয়। আর নিকটবর্তী শহর পোর্ট সাঈদ, সুয়েজ, আবু সুয়াইর ও সুবরাখিতেও শাখা সংগঠন কায়েম হয়। তখন ইসমাঈলিয়াতেই অবস্থিত ছিলো আল ইখওয়ানুল মুসলিমূনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়।

এখানে নির্মাণ করা হয় একটি মাসজিদ। কিছুকাল পর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের পাশে বালকদের জন্য একটি ও বালিকাদের জন্য আরেকটি স্কুল স্থাপিত হয়। এই স্কুলগুলোতে এমন শিক্ষাপদ্ধতি চালু করা হয় যাতে একজন শিক্ষার্থী পার্থিব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জনের সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে উঠে। আরো কিছুকাল পর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সন্নিকটে গড়ে তোলা হয় ক্লাব। এই ক্লাবে শরীর চর্চা ও নির্মল আনন্দদানের বিভিন্ন আয়োজন ছিলো। লোকদের কর্মসংস্থানের জন্য নিকটেই গড়ে তোলা হলো কুটির-শিল্প প্রতিষ্ঠান।

কেন্দ্রীয় কার্যালয় ছিলো মডেল। শাখা-সংগঠনগুলো শক্তিশালী হলেই মাসজিদ নির্মাণ, শিক্ষালয় স্থাপন, ক্লাব গঠন ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতো।

শায়খ হাসানুল বান্নার বিরুদ্ধে অভিযোগ

এই সময় মিসরের মসনদে আসীন ছিলেন কিং ফুয়াদ। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইসমাঈল সিদকী পাশা। আল ইখওয়ান তখনো কোন শক্তিধর সংগঠন ছিলোনা। তথাপিও প্রধানমন্ত্রী ইসমাঈল সিদকীপাশা এইটিকে বাঁকা চোখে দেখতেন।

শায়খ হাসানুল বান্না একটি সরকারী উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারনা শুরু হলো এই বলে যে তিনি সরকারী টাকা খরচ করে দল গঠন করছেন। তাঁর কার্যাবলী পরীক্ষা করার জন্য একটি কমিটিও গঠন করা হয়। কমিটি তদন্ত করে আপত্তিকর কিছুই পেলোনা। আসলে তাঁকে হয়রানি করাই ছিলো এই অভিযোগের আসল উদ্দেশ্য।

সরকারী মহল থেকে প্রচারণা শুরু হলো যে হাসানুল বান্না কিং ফুয়াদকে ক্ষমতাচ্যুত করা ও রাজতন্ত্র খতম করার জন্য এই সংগঠন গড়ে তুলেছেন।

শায়খ হাসানুল বান্না কায়রোতে বদলি

১৯৩২ সনের অক্টোবর মাসে শায়খ হাসানুল বান্না কায়ারোতে বদলি হন। এই বদলি আল ইখওয়ানের জন্য কল্যাণকর হয়েছিলো। আল ইখওয়ানের কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থানান্তরিত হয় কায়রোতে। এখানে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু হয়। বুঝা যাচ্ছিলো, আগামী দিনগুলোতে আল ইখওয়ান একটি শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

উল্লেখ্য যে কায়রোতে বদলি হওয়ার পর শায়খ হাসানুল বান্না বিয়ে করেন। একটি মাসজিদে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর বিয়ে সম্পন্ন হয়।

প্রধানমন্ত্রী ইসমাঈল সিদকী পাশা আল ইখওয়ানের ওপর বিশেষ দৃষ্টি রাখছিলেন। কিন্তু তিনি আল ইখওয়ানকে ভালো চোখে দেখতেন না। তবে নৈতিক ভাবে দুর্বল করে ফেলার জন্য তিনি আল ইখওয়ানকে অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব করেন। বিচক্ষণ শায়খ হাসানুল বান্না এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

শায়খ হাসানুল বান্না কেন্দ্রীয় কার্যালয়টিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। স্কুলে যাবার আগে তিনি কার্যালয়ে আসতেন। সেই দিনের করণীয় কাজের ফিরিস্তি তৈরি করে সহকারীদের হাতে দিয়ে যেতেন। স্কুল থেকে ফেরার পথে তিনি আবার আসতেন কার্যালয়ে। বিকালের সময়টাতে সাধারণত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হতো। এই সভায় তিনি আল কুরআনে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখতেন।

আল আখাওয়াত আলমুসলিমাত গঠন

শায়খ হাসানুল বান্না মহিলাদেরকে স্বতন্ত্রভাবে সংগঠিত করা ও তাদের মাধ্যমে মহিলা অংগনে দীনের মর্মবাণী পৌঁছিয়ে দেয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। আল

ইখওয়ানের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিকটে স্থাপিত উম্মাহাতুল মুমিনীন মাদ্রাসার শিক্ষিকাদেরকে নিয়ে তিনি আল ইখওয়ানের মহিলা শাখা গঠন করেন। এর নাম রাখা হয় আল আখাওয়াত আল মুসলিমাত। মহিলাদের মধ্যে কিভাবে ও কি কি উপকরণ ব্যবহার করে দাওয়াত সম্প্রসারিত করতে হবে, তাও নির্ধারিত করে দেয়া হয়।

আল ইখওয়ানের সাধারণ সম্মেলন

১৯৩৩ সনে শায়খ হাসানুল বান্নার আহ্বানে কায়রোতে অনুষ্ঠিত হয় আল ইখওয়ানের প্রথম সাধারণ সম্মেলন। মিসরে তখন খৃষ্টান মিশনারীদের ব্যাপক তৎপরতা চলছিলো। এই সম্মেলনে এই বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা হয়। সম্মেলন শেষে কিং ফুয়াদকে একটি চিঠির মাধ্যমে খৃষ্টান মিশনারীদের তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

এই সনের শেষের দিকে আরেকটি সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে দাওয়াত সম্প্রসারণের উপায় নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় একটি প্রিন্টিং প্রেস স্থাপনের।

এই সম্মেলনের পর আল ইখওয়ানের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মাজাল্লাতুল ইখওয়ানুল মুসলিমূন" প্রকাশনা শুরু হয়। শায়খ হাসানুল বান্নার বক্তব্য মুদ্রিত হয়ে একের পর এক আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।

শায়খ হাসানুল বান্না দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে প্রবন্ধ লিখতেন। সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য পরিবেশিত হতো। শায়খ হাসানুল বান্না শাখা সংগঠনগুলোতে সাপ্তাহিক আলোচনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন।

১৯৩৫ সনে শায়খ হাসানুল বান্নার আহ্বানে আল ইখওয়ানুল মুসলিমূনের তৃতীয় সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সাংগঠনিক বিষয়াদির আলোচনা প্রাধান্য পায়। সদস্যদের মান, বৈশিষ্ট, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রোভার স্কাউট গঠনের সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়।

১৯৩৭ সনে মিসরের মসনদে বসেন কিং ফারুক। তরুণ ফারুক একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটার মুসতাফা আল মারাগীর প্রভাব ছিলো তাঁর ওপর। তাঁর শাসনকালে মিসরে ইসলামের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে, এটাই ছিলো সকলের আশা। এই আশা নিয়েই আল ইখওয়ানুল মুসলিমূন কিং ফারুকের অভিষেক উৎসব পালন করে। এই উৎসব পালন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত

হয় আল ইখওয়ানের চতুর্থ সাধারণ সম্মেলন। উল্লেখ্য যে পরবর্তী সময়ে কিং ফারুক দীনের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েন।

আলী মাহির পাশার সরকারের প্রতি সমর্থন

কিং ফারুক প্রধানমন্ত্রী বানান আলী মাহির পাশাকে। আলী মাহির পাশা আল ইখওয়ানের বর্ধিষ্ণু শক্তি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। তিনি তাঁর পরিচালিত সরকারের প্রতি আল ইখওয়ানের সমর্থন চান। আলী মাহির পাশা ইসলামের প্রতি খুবই অনুরাগী ছিলেন। তাঁকে সমর্থন দেয়ার অর্থ ছিলো সরকারের ইসলাম প্রিয় অংশটিকে শক্তিশালী করা। শায়খ হাসানুল বান্না পরামর্শ পরিষদে বিষয়টি তোলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর আলী মাহির পাশার সরকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিছু সংখ্যক সদস্য এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা তাঁদের ভিন্নমত ব্যক্ত করেন। তাঁরা শায়খ হাসানুল বান্নার সহকারী আহমাদ আশ্‌শুককারীর পদত্যাগ দাবি করেন। তাঁদের ধারণা ছিলো যে এই ব্যক্তিটিই সরকারের সাথে আল ইখওয়ানের সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম। শায়খ হাসানুল বান্না আহমাদ আশ্ শুককারীর বরখাস্তের দাবি মেনে নেননি। এতে উক্ত সদস্যগণ নাখোশ হন।

১৯৩৯ সনের জানুয়ারী মাসে শায়খ হাসানুল বান্নার আহ্বানে আল ইখওয়ানের পঞ্চম সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কায়রোতে।

ইতিমধ্যে আল ইখওয়ান সারাদেশে বিপুল সাংগঠনিক সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। আল ইখওয়ান মিসরের রাজনীতিতে একটি গণ্য শক্তিতে পরিণত হয়। নতুন সদস্যগণ যাতে আল ইখওয়ান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে পারে সেই জন্য তিনি এই সম্মেলনে তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছিলেন,

"আল ইখওয়ানুল মুসলিমূন একটি সালাফীয়া আহ্বান, একটি সুন্নীপথ, একটি সুফী বাস্তবতা, একটি রাজনৈতিক দল, একটি ক্রীড়া সংস্থা, একটি শিক্ষা-সংস্কৃতি পরিষদ, একটি অর্থনৈতিক সংগঠন ও একটি সমাজ দর্শন।"

ত্বরা-প্রবণ কিছু লোকের ভূমিকা

ইতিমধ্যে আল ইখওয়ানের একটি অতি উৎসাহী গ্রুপ সক্রিয় হয়ে উঠে। এরা ছিলো রোভার স্কাউটদেরই একটি অংশ। এরা মনে করলো যে বিপ্লবের সময় এসে গেছে। এখন দেরি করা কাপুরুষতার নামান্তর। ক্ষমতা দখল করে নিলেই হয়।

তারা যুক্তি দেখালো যে আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, "যদি তোমাদের কেউ কোন গর্হিত কাজ হতে দেখে তবে সে তার হাত দ্বারা তার প্রতিরোধ করবে, যদি তা করতে সক্ষম না হয় তবে জবান দ্বারা তার প্রতিবাদ করবে, যদি তাও করা সম্ভব না

হয় তা হলে হৃদয়ে তা প্রতিরোধের চিন্তা-ভাবনা করবে। অবশ্য শেষটি হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।"

এদের বক্তব্যের জবাবে শায়খ হাসানুল বান্না আল কুরআনের আয়াত বিশেষের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আল্লাহ্ বলেন, "তুমি লোকদেরকে তোমার রবের পথে ডাক হিকমাহ ও সুন্দর বক্তব্যসহকারে। আর তাদের সাথে আলাপ কর অতীব সুন্দর পদ্ধতিতে। তোমার রব জানেন কে তাঁর পথ ছেড়ে বিভ্রান্ত হয়েছে, আর জানেন কে হিদায়াত অনুসরণ করে চলছে।"

এই আয়াত উদ্ধৃতির মাধ্যমে শায়খ হাসানুল বান্না ইসলামী বিপ্লবের সুস্থ ও স্বাভাবিক পদ্ধতি কী তা তাদের সামনে তুলে ধরেন।

শায়খ হাসানুল বান্না হাওয়ার দোলায় আন্দোলিত হবার মতো ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি স্রোতের সাথে ভেসে যাবার পাত্র ছিলেন না। হঠকারিতার পরিণতি কী হতে পারে তাও তিনি বুঝতেন। তাই তিনি স্বীয় মতে অটল থাকেন।

কিছু লোক সংগঠন ছেড়ে চলে যায়।

সরকারের ওপর ইংরেজদের ও আল ইখওয়ানের চাপ

১৯৩৯ সনে শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। গ্রেট বৃটেন চাচ্ছিলো মিসর তার পক্ষাবলম্বন করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুক। অথচ গ্রেট বৃটেনের পক্ষাবলম্বন করার মানে ছিলো তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামা। অর্থাৎ মুসলিম সৈন্যগণ মুসলিম সৈন্যদেরকে আহত ও নিহত করা। এমন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ ব্যাপার ছিলো না। শায়খ হাসানুল বান্না এই বিষয়ে সরকারকে পূর্বাহ্নে হুঁশিয়ার করে দেন।

প্রধানমন্ত্রী আলী মাহির পাশা ও প্রধান সেনাপতি জেনারেল আযীয আলী আল মিসরীও ইংরেজ তোষণ নীতি গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

ইংরেজদের বিরাট স্বার্থ তখন সুয়েজে। মিসরের স্বাধীনচেতা সরকার গ্রেট বৃটেনের স্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপ নিতে পারে, এই আশংকা তাদেরকে পেয়ে বসে। ইংরেজগণ গোপনে কিং ফারুকের ওপর কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। দুঃখের বিষয়, কিং ফারুক ইংরেজদের চাপের মুখে নতি স্বীকার করেন।

১৯৪০ সনে কিং ফারুক প্রধান সেনাপতি জেনারেল আযীয আলী আলমিসরীকে দীর্ঘ ছুটিতে পাঠিয়ে দেন। এই ছুটি আর কোনদিন শেষ হয়নি।

কিছু দিন পরে আলীমাহির পাশাকেও পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। মিসরে ইংরেজদের কূটনীতি বিজয় লাভ করে।

১৯৪০ সনের জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন হাসান সাবরী পাশা। তাঁর নেতৃত্বে মিসর আফ্রিকার রণাংগনে গ্রেট বৃটেনের পক্ষে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ঐ বছরের নবেম্বর মাসে হাসান সাবরী পাশা ইন্তিকাল করলে নতুন প্রধানমন্ত্রী হন হুসাইন সিররী পাশা।

১৯৪১ সনে শায়খ হাসানুল বান্না আল ইখওয়ানের ষষ্ঠ সাধারণ সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলন কায়রোতে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে আগামীতে জাতীয় নির্বাচনগুলোতে অংশ গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আগেই বলেছি, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আলী মাহির পাশা ও প্রাক্তন প্রধান সেনাপতি আযীয আলী আল মিসরী গ্রেট বৃটেনের তাবেদারি করতে প্রস্তুত ছিলেন না। জনগণের ওপর তাঁদের বেশ প্রভাব ছিলো। পাছে শায়খ হাসানুল বান্না তাঁদের সাথে মিলিত হয়ে সরকার বিরোধী কোন মোর্চা গড়ে তোলেন এই আশংকায় শায়খ হাসানুল বান্নাকে অন্যত্র বদলি করা হয়। গৃহবন্দী করা হয় আলী মাহির পাশাকে। আর গ্রেফতার করা হয় আযীয আলী আল মিসরীকে।

শায়খ হাসানুল বান্নার প্রথম গ্রেফতারী

অল্প কাল পরেই শায়খ হাসানুল বান্না কায়রোতে আসেন ইংরেজ বিরোধী জনমত গড়ে তোলার জন্য। সরকার আতংক গ্রস্ত হয়ে পড়ে। সরকার শায়খ হাসানুল বান্না ও সংগঠনের সেক্রেটারী জেনারেল আবদুল হাকীম আবিদীনকে গ্রেফতার করে। আল ইখওয়ানের পত্রিকাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। অন্য সব পত্রিকায় আল ইখওয়ানের কোন খবর ছাপানো যাবে না বলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। মিছিল ও জনসভা নিষিদ্ধ হয়।

সরকারের এই পদক্ষেপ গণ-মনে দারুণ অসন্তোষ সৃষ্টি করে। জনমতের দিকে লক্ষ্য করে সরকার শায়খ হাসানুল বান্না ও আবদুল হাকীম আবিদীনকে মুক্তি দেয়।

গ্রেট বৃটেন বরাবরই ইসলামের প্রতি বৈরি মনোভাব পোষণ করে আসছিলো। মিসরে ক্রমবর্ধমান ইসলামী জাগরণ গ্রেট বৃটেনকে শংকিত করে তোলে। কূট কৌশলের মাধ্যমে ইসলামী শক্তিকে বশে আনা যায় কিনা সেই চেষ্টাও তারা করে। গ্রেট বৃটেনের দূতাবাস থেকে শায়খ হাসানুল বান্নার সাথে যোগাযোগ করা হয়। দূতাবাসের একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা আল ইখওয়ানুল মুসলিমূনের লক্ষ্য, কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি জানতে চান। তাঁকে সব জানানো হয়। সব শুনে তিনি বাহ্যতঃ সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আল ইখওয়ানকে আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব দেন। বিচক্ষণ শায়খ হাসানুল বান্না ধন্যবাদ সহকারে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

প্রধানমন্ত্রী হুসাইন সিররী পাশা নির্বিঘ্নে শাসন চালাতে পারছিলেন না। ইংরেজদের সাথে তাঁর মাখামাখি জনমনে ক্রোধের সঞ্চার করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। অবস্থা বেগতিক দেখে হুসাইন সিররী পাশা পদত্যাগ করেন। কিং ফারুক ওয়াফদ পার্টির নেতা মুসতাফা আন্‌নাহাস পাশাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন।

এই সময় সেনাবাহিনীর তরুণ অফিসারদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। তারা একদিকে কিং ফারুক ও অন্য দিকে প্রধানমন্ত্রী পরিচালিত প্রশাসনের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠে। দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা তাদেরকে বিরক্ত করে তোলে। কিছু সংখ্যক তরুণ অফিসার "ফ্রি অফিসারস" নামে একটি গোপন সংস্থা গড়ে তোলে। তারা একটি সামরিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা আঁটছিলো। এই অফিসারগণ দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁদের সাথে যোগাযোগ শুরু করে। আনোয়ারুস সা'দাত ও আবদুল মুনীম আবদুর রউফ শায়খ হাসানুল বান্নার সাথে যোগাযোগ করেন।

শর্ত সাপেক্ষে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানো

এই দিকে প্রধানমন্ত্রী মুসতাফা আন্‌নাহাস পাশা পার্লামেন্টের নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। আল ইখওয়ান নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রস্তুতি নিতে থাকে। সিদ্ধান্ত হলো শায়খ হাসানুল বান্না ইসমাঈলিয়া নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

প্রধানমন্ত্রী মুসতাফা আন নাহাস পাশা দেখলেন যে আল ইখওয়ান নির্বাচনে নামলে তাঁর দল ওয়াফ্‌দ পার্টি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সেই জন্য তিনি শায়খ হাসানুল বান্নাকে তাঁর কাছে ডেকে নেন এবং আল ইখওয়ান যাতে নির্বাচনে না নামে তার জন্য চাপ দেন। অনেক বাদানুবাদ হয়। অবশেষে কতগুলো শর্ত সাপেক্ষে আল ইখওয়ান নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করতে সম্মত হয়। প্রধানমন্ত্রী ওয়াদা করেন যে আল ইখওয়ানকে নির্বিঘ্নে কাজ চালিয়ে যেতে দেয়া হবে। মদ ও বেশ্যাবৃত্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আল ইখওয়ানের পত্র পত্রিকাগুলোর ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হবে।

১৯৪২ সনের শেষ ভাগে প্রধানমন্ত্রী মুসতাফা আন্ নাহাস পাশা বেঁকে বসেন। আল ইখওয়ানের প্রতি তিনি আবার বৈরি মনোভংগি দেখাতে শুরু করেন। সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা আল ইখওয়ানের শাখাগুলোর কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়। কেবল মাত্র কেন্দ্রীয় কার্যালয়টি নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হয়।

মুসতাফা আন্ নাহাস পাশার সরকার ইংরেজদের সমর্থন পুষ্ট ছিলো। এই সরকার শায়খ হাসানুল বান্নাকে তাদের পথে সবচে' বড়ো কাঁটা মনে করতো। শুনা যাচ্ছিলো, শায়খ বান্নাকে অচিরেই কোথাও নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়া হবে। তিনি এর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে থাকেন। আর একটি সার্কুলার লেটারের মাধ্যমে তিনি কর্মীদের জন্য বিশেষ হিদায়াত পাঠান। এই চিঠির একাংশে তিনি লেখেন,

"তোমরা নানাবিধ কষ্ট ও বাধার সম্মুখীন হবে। আর প্রকৃতপক্ষে তখনি তোমরা এই মিশনের ধারক বাহকদের পথে অগ্রসরমান বুঝতে হবে।.... ইসলামের প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা তোমাদের পথে বাধার সৃষ্টি করবে। তোমরা দেখবে ধর্মধারী ও সরকারী আলিমগণ তোমাদের ইসলাম সম্পর্কিত ধারণাকে আজগুবী বলে আখ্যায়িত করবে। তোমরা যে ইসলামের সৈনিক তা-ই অস্বীকার করবে। নেতৃস্থানীয়, সম্মানিত ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ তোমাদেরকে ঈর্ষা করবে। একটির পর একটি সরকার এসে তোমাদেরকে বাধা দেবে। এদের প্রত্যেকে তোমাদের কাজ ব্যাহত করতে চাইবে ও তোমাদের অগ্রগতি রোধ করতে চাইবে।.... এইভাবে তোমরা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তোমাদেরকে ধরপাকড় করা হবে। বন্দী করে রাখা হবে। নির্বাসিত করা হবে। তোমাদের সম্পত্তি বাজেয়াফ্ত করা হবে। তোমাদের বিশিষ্ট কাজগুলো বন্ধ করে দেয়া হবে। তোমাদের গৃহে তল্লাশী চালানো হবে। তোমাদের এই পরীক্ষার কাল দীর্ঘ হতে পারে।.... কিন্তু আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে যারা তাঁর পথে সংগ্রাম করে ও কল্যাণকর কাজ করে তিনি তাদেরকে সাহায্য করবেন।.... ওহে আমার ভাইয়েরা, তোমরা কি আল্লাহর দীনের রক্ষক হতে দৃঢ় সংকল্প?"

শায়খ হাসানুল বান্নাকে নির্বাসিত করা হয়নি। তবে চলার পথের কাঠিন্য সম্পর্কে তিনি যেই চিত্র অংকন করেছেন তা তাঁর সাথীগণ প্রত্যক্ষ করেছেন পদে পদে।

সালিহ আশমাওয়ীর গুপ্ত বাহিনী

১৯৪৩ সনের গোড়ার দিকে আল ইখওয়ানের কতিপয় সদস্য এক অনাকাংখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তারা একটি গুপ্ত বাহিনী গঠন করে। এই বাহিনীর প্রধান হন সালিহ আশমাওয়ী। এই গুপ্ত বাহিনী অস্ত্র প্রয়োগ করে বিপ্লব আনয়নে বিশ্বাসী ছিলো। গঠিত হবার পর থেকেই এই বাহিনী এখানে ওখানে বারবার পুলিশের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

এই গুপ্ত বাহিনীর তৎপরতার সকল বদনাম আল ইখওয়ানের ওপর চাপানো হয়। আল ইখওয়ানকে বারবার দারুণ মুসীবাতের সম্মুখীন হতে হয়।

১৯৪৪ সনে কিং ফারুক ওয়াফদ পার্টির মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেন। সা'দিষ্ট পার্টির নেতা আহমাদ মাহির পাশা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি দেশে সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন।

পার্লামেন্ট নির্বাচনে আল ইখওয়ান

১৯৪৫ সনের জানুয়ারী মাসে মিসরে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পার্লামেন্ট গঠনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে আল ইখওয়ানুল মুসলিমূন অংশগ্রহণ করে। শায়খ হাসানুল বান্না ইসমাঈলিয়া থেকে ও অন্য নেতৃবৃন্দ অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। জনমত এতোখানি অনুকূল ছিলো যে নেতৃবৃন্দের সকলেই নির্বাচিত হওয়ার কথা।

চরম দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে বহুমুখী কারসাজি করে শায়খ হাসানুল বান্না ও তাঁর সহকর্মীদের নিশ্চিত বিজয়কে পরাজয়ে রূপান্তরিত করা হয়। আহমাদ মাহির পাশার দলকে জয়ী করা হয়।

শায়খ হাসানুল বান্নার দ্বিতীয় গ্রেফতারী

নির্বাচনের পর আহমাদ মাহির পাশা শক্ত হয়ে বসেন। তিনি ইংরেজদের ইচ্ছা পূরণের উদ্যোগ নেন। সিদ্ধান্ত নেন জার্মেনী ও তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার।

১৯৪৫ সনের ২৪শে ফেব্রুয়ারী আহমাদ মাহির পাশা যুদ্ধে নামার সিদ্ধান্ত সম্বলিত ঘোষণাটি পাঠকালে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। প্রচার করা হলো, এইটি আল ইখওয়ানের কাজ। শায়খ হাসানুল বান্না, আহমাদ আশ্ শুককারী ও আবদুল হাকীম আবিদীনকে গ্রেফতার করা হয়।

আততায়ী ধরা পড়েছিলো। জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে স্বীকার করে যে সে নাশনালিষ্ট পার্টির লোক। অতপর শায়খ হাসানুল বান্না ও তাঁর দুইজন সহকর্মীকে মুক্তি দেয়া হয়।

পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হন মাহমুদ ফাহমী আন্ নুক্রাশী পাশা। শায়খ হাসানুল বান্না তাঁর সাথে দেখা করেন। আহমাদ মাহির পাশার হত্যাতে দুঃখ প্রকাশ করেন। এই সুযোগে তিনি তাঁকে আল ইখওয়ানের লক্ষ্য, কর্মসূচীও কর্মপদ্ধতি অবহিত করেন।

মাহমুদ ফাহমী আন্নুকরাশী পাশা আল ইখওয়ানকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। শায়খ হাসানুল বান্নার সাক্ষাত ও আলাপের পরও তাঁর মনোভংগির কোনই পরিবর্তন হয়নি। বরং তিনি আল ইখওয়ানের ওপর গোয়েন্দা নজরদারি আরো বাড়িয়ে দেন।

মিসরের জনমত ছিলো ইংরেজদের বিরুদ্ধে। সুয়েজে ইংরেজদের অবস্থান জনগণ মেনে নিতে পারছিলো না। গ্রেট বৃটেনের প্রতি নতজানু নীতি দেশের গণ-মানুষকে

বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তরুণ সমাজ সরকার বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা মুসতাফা মুমিনের নেতৃত্বে ছাত্রগণ প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ছাত্র আন্দোলনের তীব্রতার মুখে মাহমুদ ফাহমী আন্‌নুকরাশী পাশা পদত্যাগ করেন। উল্লেখ্য যে মুসতাফা মুমিন আল ইখওয়ানের ছাত্র-শাখার একজন নেতা ছিলেন।

১৯৪৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন ইসমাইল সিদকী পাশা। তিনিও ইংরেজদের বশংবদ ছিলেন। আল ইখওয়ান গ্রেট বৃটেনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ও আপোষহীন মনোভাব গ্রহণ করার জন্য সরকারের উপর চাপ দিতে থাকে। একই দাবি উত্থাপিত হয় ছাত্র ও শ্রমিকদের পক্ষ থেকে। দেশে দারুণ রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। এই অবস্থাতেও ইসমাইল সিদকী পাশা ইংরেজদের সাথে চুক্তির একটি খসড়া প্রকাশ করেন। মিসরের গণ-মানুষ বিক্ষোভের মাধ্যমে তা প্রত্যাখ্যান করে। ৮ই ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেন। মাহমুদ ফাহমী আন্‌নুকরাশী পাশা আবার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

আল ইখওয়ানে মত পার্থক্য

ওয়াফ্‌দ পার্টির সাথে আল ইখওয়ানুল মুসলিমূনের সম্পর্ক ভালো ছিলো না। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের একাংশ মত পোষণ করতেন যে জাতীয় স্বার্থে আল ইখওয়ান ও ওয়াফ্‌দ পার্টির মধ্যে সমঝোতা হওয়া উচিত। আহমাদ আশ্‌শুককারী দাবি করলেন যে মিসরের রাজনৈতিক প্রয়োজনে আল ইখওয়ান শুধুমাত্র লোক তৈরির কাজ করবে আর রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে ওয়াফ্‌দ পার্টি। এইটি ছিলো আল ইখওয়ানুল মুসলিমূনের অভ্যন্তরে বড়ো রকমের মত পার্থক্য। অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি ইবরাহীম হাসান দল ত্যাগ করেন। কিছুকাল পর বহিষ্কৃত হন আহমাদ আশ্‌শুককারী। এই মত পার্থক্য অবশ্যই আল ইখওয়ানকে বেশ খানিকটা দুর্বল করতে সক্ষম হয়।

এই দিকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে আস্থা হারিয়ে যারা গুপ্ত বাহিনী গঠন করেছিলো, তারা আরো শক্তিশালী হয়ে উঠে। সালিহ্ আশ্‌মাওয়ীর পর গুপ্ত বাহিনীর পরিচালক হন আবদুর রাহমানুস্ সানাদী।

রণাংগনে আল ইখওয়ান

১৯৪৭ সনের নবেম্বর মাসে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ফিলিস্তিন বিভক্তকরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ফিলিস্তিনের বুকে একটি ইয়াহুদী রাষ্ট্র পত্তনের জন্যই গৃহীত হয় এই প্রস্তাব। দুনিয়ার মুসলিমদের পক্ষে এই প্রস্তাব মেনে নেয়া সম্ভব ছিলো না।

ফিলিস্তিনের গ্র্যান্ড মুফতী আমীন আল হুসাইনী ইয়াহুদীদের মুকাবিলার স্বেচ্ছা সেবক বাহিনী গঠনের প্রয়োজীয়তা অনুভব করেন। আল ইখওয়ানের অন্যতম সদস্য ছিলেন সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসার মাহমুদ লাবীব। শায়খ হাসানুল বান্না তাঁকে ফিলিস্তিন পাঠান। মাহমুদ লাবীব মুফতী আল হুসাইনীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে ফিলিস্তিনী যুবকদের সমন্বয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গড়ে তুলে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। তিনি এই কাজ বেশী দিন করতে পারেননি। ইংরেজগণ তাঁকে ফিলিস্তিন ত্যাগ করতে বাধ্য করে।

এই সময় আরব লীগের উদ্যোগে মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোতে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছিলো। আল ইখওয়ানের কর্মীগণ ব্যাপক হারে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দেয়।

১৯৪৮ সন।

মুসলিম উম্মাহর জন্য এইটি ছিলো আরেকটি কঠিন বছর। ইয়াহুদীরা ফিলিস্তিনে জেঁকে বসে। ইসলামী চিন্তা নায়কগণ জিহাদের ডাক দেন। এই দুর্দিনে ফিলিস্তিনের মুসলিম ভাইদের পাশে দাঁড়ানো কর্তব্য ছিলো দুনিয়ার সকল মুসলিমের। শায়খ হাসানুল বান্না মিসর থেকে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে আল ইখওয়ানুল মুসলিমূনের সদস্যদেরকে ফিলিস্তিন পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। আহমাদ আবদুল আযীযের কমান্ডে একদল স্বেচ্ছাসেবক অচিরেই আল আরিস গিয়ে পৌঁছে। সেনা বাহিনী ছেড়ে আসা কামালুদ্দীন হুসাইন ও সালাহ সালিম স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদান করেন। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ইয়াহুদীদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

ফালুজা অঞ্চলে মিসরীয় সেনাবাহিনীর একটি দল ইয়াহুদীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে গিয়েছিলো। আল ইখওয়ানের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তাদের সাহায্যে এগিয়ে যায়।

রণাংগনে আল ইখওয়ানের বীরত্ব ও দেশময় তাদের জনপ্রিয়তা দেখে ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিলেন ইংরেজদের প্রিয়পাত্র প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ ফাহমী আন্নুকরাশী পাশা। কিং ফারুকের মনেও ভয় ঢুকে গেলো। এই বুঝি আল ইখওয়ান গোটা মিসর দখল করে বসে!

আল ইখওয়ানের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নিরস্ত্রীকরণ

ফিলিস্তিন রণাংগনে আল ইখওয়ানের স্বেচ্ছাসেবকগণ বীরের মতো লড়ছিলো ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে। ইয়াহুদীরা এদেরকে ভীষণ ভয় করতো। দু:খের বিষয় তাদের সাফল্যই তাদের কাল হয়ে দাঁড়ালো। একদিন রাতে মিসরের সেনাবাহিনী

স্বেচ্ছাসেবকদের শিবিরগুলো ঘিরে ফেলে। প্রধান সেনাপতি ফুয়াদ সাদিক তাদেরকে নির্দেশ দেন অস্ত্র ত্যাগ করে দেশে ফিরে যেতে অথবা সরাসরি মিসরীয় সেনাবাহিনীর কমাণ্ডে থেকে যুদ্ধ করতে। ক্ষুণ্ন মনে কেউ দেশে ফিরে গেলো। কেউ বা কোন না কোনভাবে যুদ্ধের ময়দানে থেকে যাওয়াকেই শ্রেয় মনে করলো।

আল ইখওয়ানুল মুসলিমূনকে বেআইনী ঘোষণা

ইতিমধ্যে সারাদেশে আল ইখওয়ানুল মুসলিমূনের শাখা সংখ্যা দুই হাজারে উন্নীত হয়। জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় বিশ লাখ।

আল ইখওয়ানের অব্যাহত শক্তি বৃদ্ধি সরকারকে ভীত-শংকিত করে তোলে। মাহমুদ ফাহমী আন্নুকরাশী পাশা আল ইখওয়ানুল মুসলিমূনকে বে-আইনী ঘোষণার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে শুরু করেন। বিভিন্ন স্থানে বোমা ও অস্ত্রশস্ত্র রেখে বলা হতে থাকে যে এইগুলো আল ইখওয়ানের কাণ্ড। বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তি আততায়ীর হাতে প্রাণ হারায়। বলা হলো, এইসব হত্যাকাণ্ড আল ইখওয়ান সংঘটিত করেছে।
১৯৪৮ সনের ৮ই ডিসেম্বর।
রাত এগারোটা। শায়খ হাসানুল বান্না তাঁর সহকর্মীদেরকে নিয়ে কায়রোতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বসে রেডিওতে প্রচারিত খবর শুনছিলেন। খবর প্রচারিত হলো, আল ইখওয়ানুল মুসলিমূনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ হিসেবে বলা হলো যে আল ইখওয়ান দেশে একটি সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাবার প্রস্তুতি নিয়েছে।
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে পুলিশের গাড়ি। উপস্থিত সবাইকে গ্রেফতার করা হলো। গ্রেফতার করা হলো না শুধু শায়খ হাসানুল বান্নাকে। আল ইখওয়ানের সব সম্পদ বাজেয়াফত করা হয়। আল ইখওয়ান পরিচালিত স্কুল, ক্লাব, হাসপাতাল, ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়।
ডিসেম্বর মাসে ঘটে আরেক ঘটনা। আবদুল মাজীদ আহমাদ হাসান নামক ২৩ বছর বয়সী একজন ছাত্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ ফাহমী আন্নুকরাশী পাশাকে হত্যা করে। এবারও উদোরপিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানো হয়। আল ইখওয়ানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার তীব্রতর করা হয়।
নতুন প্রধানমন্ত্রী হন ইবরাহীম আবদুল হাদী। আল ইখওয়ান তো দূরে থাক, তিনি কোন রাজনৈতিক দলের প্রতিই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তবুও শায়খ হাসানুল বান্না তাঁর সাথে দেখা করেন। তাঁকে নানাভাবে বুঝাতে থাকেন যাতে আল ইখওয়ানের ওপর থেকে তিনি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। কিন্তু কোন ফল হলো না।
শায়খ হাসানুল বান্না আশা ছাড়লেন না। সরকারী মনোভাব পরিবর্তনের জন্য তিনি ধৈর্যসহকারে প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন।

এই সময় ঘটে গেলো আরেক বিপর্যয়। জীপে রক্ষিত বোমা সংক্রান্ত মামলার কাগজপত্র রক্ষিত ছিলো কোর্ট বিল্ডিংয়ের একটি কক্ষে। সেখানে একটি বিস্ফোরণ ঘটাবার চেষ্টা হয়। কিন্তু বোমাটি যথাস্থানে রাখা হয়নি। যথাসময়ে বোমা ফুটলো। কোর্ট বিল্ডিংয়ের বেশ ক্ষতি হয়। বিস্ফোরণের পর শফিক ইবরাহীম আনাস নামক এক ব্যক্তি বন্দী হয়। প্রচার করা হলো যে এই ব্যক্তি আল ইখওয়ানের সদস্য।

সন্ত্রাসী তৎপরতার বিরোধিতা

শায়খ হাসানুল বান্না সরকারকে জানালেন যে সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সাথে তাঁর বা তাঁর সহকর্মীদের কোনই সম্পর্ক নেই। এই সময় তিনি আল ইখওয়ানের সদস্যদের প্রতি গোপনে একটি চিঠি পাঠান। এই চিঠিতে তিনি সুস্পষ্টভাবে সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কে লিখেন যে "এরা আল ইখওয়ানও নয়, আল মুসলিমূনও নয়।"

ব্যাপক গ্রেফতারী ও নির্যাতন

সারা দেশ থেকে আল ইখওয়ানের লোকদেরকে গ্রেফতার করা হয়। বন্দীদের সংখ্যা কয়েক হাজারে দাঁড়ায়। জেলখানায় তাদের ওপর চালানো হয় নির্যাতন।
কেন্দ্র থেকে শুরু করে গ্রাম-পর্যায়ের সদস্যদেরকে গ্রেফতার করা হয়, কিন্তু শায়খ হাসানুল বান্নাকে গ্রেফতার করা হয়নি। শায়খ বলতেন, তাঁকে গ্রেফতার না করার অর্থ হচ্ছে যে তাঁর মৃত্যু পরোয়ানা জারি হয়েছে।

শায়খ হাসানুল বান্নার শাহাদাত

১৯৪৯ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারী।
এই দিন কায়রোতে ইয়াং মুসলিমস এসোসিয়েশানের একটি মিটিংয়ে শায়খ হাসানুল বান্না মেহমান বক্তা হিসেবে আসেন। মিটিং শেষে তিনি উক্ত সংস্থার কার্যালয় থেকে বের হন। রাস্তায় নেমে তিনি ট্যাকসীতে উঠতে যাচ্ছিলেন এমন সময় আততায়ীর গুলি এসে বিঁধে তাঁর বুকে। রক্ত রঞ্জিত দেহ নিয়ে শায়খ হাসানুল বান্না ঢলে পড়েন। সংগীরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহর দীনের সৈনিক আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্যে চলে যান।
লাশ পাঠানো হয় তাঁর বাসায়। পুলিশ এসে বাড়ির চারদিকে ঘেরাও করে ফেলে। নিকট আত্মীয় ছাড়া আর কাউকে ঢুকতে দেয়া হলোনা তাঁর বাড়িতে। ট্যাংক বাহিনী ও সাঁজোয়া বাহিনীর কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীসহকারে তাঁর লাশ কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। লক্ষ লক্ষ লোক দূরে অবস্থান করে অশ্রু বিসর্জন করতে থাকে। সরকার তাদেরকে তাঁর জানাযা ও দাফন কাজে অংশগ্রহণ করতে দিলোনা।

শায়খ হাসানুল বান্নার উত্তরসূরী

ইতিমধ্যে আল ইখওয়ানুল মুসলিমূনের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করে কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছিলো। ১৯৫১ সনের ১৭ই সেপ্টেম্বর মিসরের সুপ্রীম কোর্ট নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে রায় দেয়। আল ইখওয়ান আবার বৈধ সংগঠন রূপে কাজ শুরু করে।

অক্টোবর মাসে হাসান ইসমাঈল আল হুদাইবী আল ইখওয়ানুল মুসলিমূনের আল মুর্শিদুল আম নির্বাচিত হন। তাঁর ডেপুটি নিযুক্ত হন আবদুল কাদির আওদাহ। কিছুকাল পর ভাইস মুর্শিদ নামে আরেকটি পদ সৃষ্টি করা হয়। এই পদে নিযুক্ত হন মুহাম্মাদ খামিস হুমাইদা। হাসান ইসমাঈল আলহুদাইবীও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন।

তিনিও গুপ্ত বাহিনীকে স্বীকৃতি দেননি। শায়খ হাসানুল বান্নার মতো তিনিও ছিলেন সন্ত্রাসবাদের ঘোর বিরোধী।

উপসংহার

শায়খ হাসানুল বান্নার (রহ) প্রতিষ্ঠিত সংগঠন আল ইখওয়ানুল মুসলিমূন পথের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে সামনে এগিয়ে চলছে। বিভিন্ন আরব দেশে তাদের বিভিন্নমুখী তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিমের দেশগুলোতেও শায়খ হাসানুল বান্নার চিন্তাধারার অনুসারীদের সংখ্যা নগণ্য নয়।

বাদীউয্ যামান সাঈদ নুরসী (রহ)

সুফী মিরযা আফিন্দীর পরিবার

তুর্কীর বিত্‌লিস অঞ্চলের ছোট্ট একটি গ্রামের নাম নুরস। এই গ্রামের একটি কুর্দ পরিবারের প্রধান ছিলেন মিরযা আফিন্দী। তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম ছিলেন। খুবই পরিচ্ছন্ন ছিলো তাঁর জীবনধারা। লোকেরা তাঁর নাম দিয়েছিলো সুফী মিরযা। তাঁর স্ত্রীও ছিলেন একজন নেক মহিলা। এই মহিলার নাম ছিলো নুরিয়া হানিম।

এই দম্পত্তির ছিলো সাত সন্তানঃ দুররিয়া, হানিম, আবদুল্লাহ, সাঈদ, মাহমুদ, আবদুল মাজীদ ও মারজান। সকলেই ছিলেন সুসন্তান। তবে ইসলামী জাগরণের ইতিহাসে সাঈদ অনেকটুকু স্থান দখল করে রয়েছেন।

সাঈদ নুরসী

খৃষ্টীয় ১৮৭৭ সনে সাঈদ জন্মগ্রহণ করেন। নুরস গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তিনি সাঈদ নুরসী নামে পরিচিত হন। পরবর্তীকালে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মোল্লা ফাত্‌হুল্লাহ আফিন্দী নামক একজন বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব তাঁকে 'বাদীউয্‌যামান' আখ্যা দেন। তখন থেকে তিনি বাদীউয্‌যামান সাঈদ নুরসী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

সাঈদ নুরসীর শিক্ষা জীবন

নয় বছর বয়সে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। তাঁর প্রথম শিক্ষালয়ের নাম মোল্লা আমীন আফিন্দী মাদ্রাসা। পরবর্তীকালে মীর হাসান ওয়ালী মাদ্রাসা, বায়েজিদ মাদ্রাসাসহ বেশ কয়েকটি শিক্ষালয়ে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন।

সাঈদ নুরসী একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিলো খুবই প্রখর। যেই কোন বিষয় তিনি অতি সহজে আয়ত্ব করতে পারতেন। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধিও ছিলো প্রশংসনীয়। তাঁর যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে লোকেরা অবাক হয়ে যেতো। উল্লেখ্য যে শরীর চর্চাতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন।

সাঈদ নুরসী ছিলেন একজন সাহসী মানুষ। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে তিনি ভয় করতেন না। তবে তিনি কখনো অবিজ্ঞ জনোচিত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি।

জিযর সফর

সাঈদ নুরসী তখন একজন উদীয়মান যুবক। এক রাতে স্বপ্নে দেখেন যে আল্লাহর এক নেক বান্দা তাঁর কাছে এসেছেন ও তাঁকে জিযর অঞ্চলের মিরান গোত্রের যালিম সরদার মুসতাফা পাশার কাছে গিয়ে তাঁকে ইসলামের পথে আসা ও যুলমের পথ পরিহার করার আহ্বান জানাতে বলছেন। ঘুম থেকে জেগে সাঈদ নুরসী আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার-র কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। মিরান গোত্র ছিল একটি শক্তিশালী গোত্র। এই গোত্রের লোকসংখ্যাও ছিলো অনেক। গোত্রের সরদার মুসতাফা পাশা দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি এলাকাতে লুণ্ঠন ও অত্যাচার চালাতেন। তুর্কীর সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামীদ রুশদের হামলা ঠেকাবার জন্য যেই অশ্বারোহী বাহিনী গঠন করেন তিনি ছিলেন সেই বাহিনীর একজন কমাণ্ডার।

সফরের প্রস্তুতি নিয়ে সাঈদ নুরসী বের হন। যথাসময়ে তিনি জিযর এসে পৌছেন। তিনি সরাসরি মুসতাফা পাশার শিবিরে চলে যান। মুসতাফা পাশা তখন অন্যত্র ছিলেন। সাঈদ নুরসী একটি তাঁবুতে বিশ্রাম নিতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর সরদার শিবিরে এসে একজন আগন্তুকের খবর পান ও তাঁর তাঁবুতে আসেন। তিনি সাঈদ নুরসীর পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চান। পরিচয় প্রদানের পর নির্ভীক সাঈদ বলেন, "আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাবার জন্য এসেছি। আপনি যুল্‌ম-অত্যাচার ত্যাগ করুন। আল্লাহর নির্ধারিত ফারযগুলো প্রতিপালন করতে শুরু করুন।"

সরদার মুসতাফা পাশা তরুণ সাঈদ নুরসীর নির্ভীকতা দেখে বিস্মিত হন। তবে ভেতরে ভেতরে তিনি একটি ফন্দি আঁটেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে জিযরের আলিমদের সাথে সাঈদের একটি বাহাসের ব্যবস্থা করতে হবে, বাহাসে পরাজিত হলে এই তরুণ ব্যক্তিটি কেটে পড়বে।

চারণভূমি থেকে ঘোড়ায় চড়ে তাঁরা তাইগ্রীস নদীর তীরবর্তী বানীহান নামক স্থানে পৌছেন। সাঈদ নুরসীর বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি যখন ঘুম থেকে উঠেন দেখেন একদল আলিম বই-কিতাব হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছেন। আলিমগণ সাঈদ নুরসীকে জিজ্ঞেস করার জন্য চল্লিশটি প্রশ্ন তৈরী করেন। প্রশ্নগুলো উত্থাপিত হলে তরুণ সাঈদ সন্তোষজনক জবাব দিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন।

সাঈদের প্রতি মুসতাফা পাশার রাগ আর থাকলো না। তিনি সাঈদকে একটি রাইফেল উপহার দেন।

মুসতাফা পাশা সালাত আদায় করা শুরু করেন। বদভ্যাসগুলো ত্যাগ করতে থাকেন।

কিছুদিন জিযরে অবস্থান করার পর সাঈদ নুরসী তাঁর এক ছাত্রকে নিয়ে মরু অঞ্চলের দিকে চলে যান। ওখানে যাবার পর তিনি খবর পান যে সরদার মুসতাফা পাশা আবার তাঁর খারাপ অভ্যাসে ফিরে গেছেন। সাঈদ নুরসী পাশাকে শুধরাবার জন্য দ্বিতীয় বার জিযরে আসেন। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও পাশাকে আর সৎ পথে আনা সম্ভব হয়নি। সাঈদ নুরসী আবারো ফিরে যান মরু অঞ্চলে।

মারদিন সফর

কিছুকাল পর সাঈদ নুরসী মারদিন পৌঁছেন। এখানে তিনি শায়খ আইউব আনসারীর মেহমান হিসেবে অবস্থান করতে থাকেন। একটি মাসজিদে তিনি দারস দেয়া শুরু করেন। লোকেরা তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতো। তিনি জ্ঞানগর্ভ জবাব দিতেন।

মারদিনে অবস্থানকালে সাঈদ নুরসী 'ইয়াং তুর্কস' আন্দোলনের অন্যতম নেতা নামিক কামালের তাত্ত্বিক লেখার সাথে পরিচিত হন।মানুষের অধিকার, মুক্তি ও স্বাধীনতার পক্ষে লেখা নামিক কামালের পুস্তিকাগুলো স্বাধীন চেতা সাঈদ নুরসীর মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি অনুভব করেন যে এই আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন। তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৮৯২ সনে তিনি রাজনৈতিক বক্তব্য রাখা শুরু করেন।

মারদিন থেকে বহিষ্কার

তাঁর তৎপরতার কথা গেলো মারদিনের গভর্ণর নাদির বে-র কানে। তিনি সাঈদ নুরসীকে গ্রেফতার করেন। তাঁর হাতে-পায়ে বেড়ি লাগানো হয়। তাঁকে মারদিন থেকে বহিষ্কার করা হয়। পুলিশ প্রহরায় তাঁকে পাঠিয়ে দেয়া হয় বিতলিস।

বিতলিসের গভর্ণরের সাথে সুসম্পর্ক

বিত্‌লিসের গভর্ণর উমার পাশার সাথে সাঈদ নুরসীর আলাপ হয়। উমার পাশা সাঈদ নুরসীর জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় পেয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েন ও সাঈদ নুরসীকে তাঁর বাড়িতেই রাখার ব্যবস্থা করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আসা-যাওয়া হতো এই বাড়িতে।

সাঈদ নুরসী আলাপচারিতার ভেতর দিয়ে তাঁদের নিকট ইসলামের আলো ছড়াতে থাকেন।

একদিন তিনি খবর পান যে গভর্ণর উমার পাশা ও আরো কিছু সরকারী কর্মকর্তা একটি মদের আসর বসিয়েছেন। সাঈদ নুরসী সোজাসুজি সেখানে চলে যান। তিনি

মদ সম্পর্কে আলকুরআন ও আল হাদীসের বিধানগুলো শুনিয়ে দিয়ে তাঁদেরকে এই হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন। এরপর তিনি সেখান থেকে চলে আসেন।

গভর্ণর উমার পাশা এই বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে খুবই রেগে যান। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলেন যে সাঈদই তো ঠিক।

তিনি সাঈদকে নিয়ে আসার জন্য দুইজন পুলিশম্যান পাঠান। সাঈদ নুরসী তাদের সাথে গভর্ণরের ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি দুর্ব্যবহারের আশংকা করছিলেন। কিন্তু তিনি ঘরে প্রবেশ করার সাথে সাথে গভর্ণর উমার পাশা দাঁড়িয়ে তাঁকে খোশ আমদেদ জানান ও বলেন, "প্রত্যেক ব্যক্তিরই কোন না কোন আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক থাকে। আপনি আমার আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক। আপনি আমার সাথেই থাকবেন।"

উমার পাশার বাড়িতে অবস্থানকালে সাঈদ নুরসী ব্যক্তিগত পড়াশুনায় গভীর মনোযোগ দেন। তিনি ব্যাপকভাবে আত্‌তাফসীর, আলহাদীস ও আল ফিক্‌হ অধ্যয়ন করেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন আল কুরআন হিফয্ করবেন। পুরো আলকুরআন হিফয করা সম্ভব হয়নি। তবে বেশী অংশই তিনি হিফয করতে সক্ষম হন।

প্রাচ্যবিদেরা ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য যেই সব লেখালেখি করেছে সেইগুলো তিনি ভালোভাবে পড়েন এবং আলকুরআন ও আলহাদীসের জ্ঞানানুশীলনের মাধ্যমে সেইগুলোর জবাবও তিনি জেনে নেন।

ওয়ান (Van) আগমন ও অবস্থান

ইসলামী জ্ঞান জগতের একজন উদীয়মান তারকা হিসেবে সাঈদ নুরসীর খ্যাতি বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ওয়ান প্রদেশের গভর্ণর হাসান পাশা তাঁকে তাঁর কাছে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। সাঈদ নুরসী ওয়ান পৌঁছে হাসান পাশার মেহমান হন। তিনি যুগপৎভাবে জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞান বিতরণের কাজ করতে থাকেন।

কিছুকাল পর ওয়ানের গভর্ণর হয়ে আসেন তাহির পাশা। তিনি একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী ছিলো। তিনি সাঈদ নুরসীর জন্য তাঁর লাইব্রেরী উন্মুক্ত করে দেন।

দূরদর্শী সাঈদ নুরসী উপলব্ধি করেন যে বর্তমানে প্রচলিত বিদ্যার সাথে নতুন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও হাছিল করা প্রয়োজন। সেই জন্য তিনি নিজেই ভূগোল, দর্শন ও ইতিহাস ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেন। এই ক্ষেত্রে তিনি নিজেই ছিলেন নিজের শিক্ষক।

ওয়ান শহরে তিনি হরহর মাদ্রাসা নামে একটি শিক্ষালয় স্থাপন করেন। এই মাদ্রাসা তিনি নিজেই পরিচালনা করতেন।

বাস্তবে শিক্ষাদান করতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন একান্ত প্রয়োজন। এই উপলব্ধিই তাঁকে তুলনামূলকভাবে অনুন্নত পূর্ব আনাতোলিয়ায় মাদ্রাসাতুয্ যাহরা নামে একটি মডেল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিতে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর পরিকল্পনা ছিলো, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামী জীবন দর্শন ও আধুনিক প্রযুক্তিতে পারদর্শী করে তুলবেন। মাদ্রাসাতুয্ যাহরার পরিকল্পনা নিয়ে তিনি রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপল গিয়েছিলেন। কিন্তু সুলতানের কাছে তা পেশ করার সুযোগ না পেয়ে ওয়ান ফিরে আসেন।

আল কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সংকল্প

একদিন গভর্ণর তাহির পাশা পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এইটি ছিলো বৃটিশ পার্লামেন্টে সেক্রেটারী ফর কলোনীজ মিঃ গ্ল্যাডস্টোনের ভাষণ সংক্রান্ত রিপোর্ট। এই ভাষণে তিনি বলেছিলেন,

"So long as the Muslims have the Quran, we shall be unable to dominate them. We must either take it from them, or make them lose their love of it."

অর্থাৎ "যতদিন মুসলিমদের হাতে আল কুরআন থাকবে আমরা তাদেরকে বশ করতে পারবোনা। হয় আমাদেরকে তাদের কাছ থেকে ঐটি নিয়ে নিতে হবে অথবা তারা যেন এর প্রতি ভালোবাসা হারিয়ে ফেলে তার ব্যবস্থা করতে হবে।"

এই ভাষণে আল কুরআনের প্রতি বৃটিশ সরকারের দৃষ্টিভংগি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় ও মুসলিমদের প্রতি অনুসৃতব্য পলিসির আভাস পাওয়া যায়।

মিঃ গ্ল্যাডস্টোনের এই বক্তব্য সাঈদ নুরসীর মনে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তিনি বলেন, "I shall prove and demonstrate to the world that the Quran is an undying, inextinguishable Sun."

অর্থাৎ "আমি প্রমাণ করবো ও দুনিয়াকে দেখাবো যে আল কুরআন মৃত্যুহীন, এবং নিভিয়ে ফেলা যায় না এমন এক সূর্য।"

তাঁর এই লক্ষ্য হাছিলের জন্য তিনি দুইটি পথ অবলম্বনের চিন্তা করেন। একটি ছিলো মাদ্রাসাতুয যাহরা স্থাপনের প্রয়াস, অন্যটি রিসালা-ই-নূর নামক পুস্তিকা সিরিজ রচনা করে আল কুরআনের জীবন দর্শন ও জীবন বিধান সম্পর্কে লোকদেরকে সজাগ করে তোলা।

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামীদের মুখোমুখি

সাঈদ নুরসী আবার উনিশ শত আট সনে কনস্ট্যান্টিনোপল আসেন। এবার তিনি সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামীদের সাক্ষাৎ পান। তিনি সুলতানকে মাদ্রাসাতুয যাহরার পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করেন। তাছাড়া সাক্ষাতের এই সুযোগে তিনি সুলতানের ব্যর্থতার কিছু দিক সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। সুলতান ও তাঁর সহকারীগণ আর কোনদিন এমন প্রত্যক্ষ সমালোচনার সম্মুখীন হননি। ফলে ইলদিজ প্রাসাদের মেহমান কোর্ট মার্শালের সম্মুখীন হন।

বিচারক তাঁকে নিয়ে বিপাকে পড়েন। অবশেষে কয়েকজন ডাক্তারের কাছ থেকে সাঈদ নুরসী মানসিকভাবে সুস্থ নন– এই সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে তাঁকে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তোপতাসি মেন্টাল হসপিটালে পাঠিয়ে দেন।

স্যালোনিকায় আগমন

তোপতাসি মেন্টাল হাসপাতাল থেকে রিলিজ হওয়ার পর তাঁর শুভাকাংখীগণ তাঁকে স্যালোনিকা নিয়ে আসেন। কমিটি অব ইউনিয়ান এন্ড প্রগ্রেস-এর অন্যতম নেতা রফিক বে-র বাড়িতে তিনি মেহমান হিসেবে অবস্থান করতে থাকেন। কমিটি অব ইউনিয়ান এন্ড প্রগ্রেসে এমন সদস্যও ছিলেন যাঁরা ইসলামের প্রতি ইতিবাচক মনোভংগি পোষণ করতেন। আবার এমন সদস্যও ছিলেন যাঁরা ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন। সাঈদ নুরসী তাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করতেন যে তুর্কীর সংহতি, অগ্রগতি ও গণ মানুষের স্বাধীনতা ইউরোপীয় নয়, ইসলামী বিধানের অনুসরণের মাঝে নিহিত। স্যালোনিকার লোকেরাও সাঈদ নুরসীর জ্ঞানের গভীরতা টের পায়। এই সুযোগ্য ব্যক্তিটিকে নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে লাগাবার অভিপ্রায় নিয়ে ইয়াহুদী নেতা ইমানুয়েল কারাসো সাঈদ নুরসীর সংগে দেখা করতে আসেন। দীর্ঘ সময় ধরে আলাপ চলতে থাকে। ইয়াহুদী নেতা হঠাৎ আলোচনা বন্ধ করে ওঠে পড়েন। বাইরে এসে তিনি সংগীদেরকে বলেন,"আমি যদি আরো কিছুক্ষণ আলোচনা চালাতাম, তাহলে ও আমাকে মুসলিম বানিয়ে ছাড়তো।"

'ইয়াং তুর্কস' ও 'কমিটি অব ইউনিয়ান এন্ড প্রগ্রেস

মুহাম্মাদ বে ও নামিক কামালের নেতৃত্বে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবিতে ইয়াং তুর্কস নামে একটি সংগঠন গড়ে উঠে। সুলতান আবদুল আযীয এই সংগঠনের প্রতি দমননীতি অবলম্বন করেন। পরবর্তী সুলতান পঞ্চম মুরাদও এই সংগঠনটিকে সুনজরে দেখতেন না। ফলে উভয় সুলতানের শাসনকালে তুর্কীর বাইরে অবস্থান করে এই সংস্থার নেতৃবৃন্দ তৎপরতা চালাতে থাকেন। পরবর্তী সুলতান দ্বিতীয়

আবদুল হামীদ তাঁদের প্রতি নমনীয় মনোভাব দেখান। ফলে তাঁরা বিদেশ থেকে কনস্ট্যান্টিনোপল ফিরে আসেন।

ইয়াং তুর্কস রাজধানীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রভাবশালী ব্যক্তির সমর্থন হাছিল করতে সক্ষম হয়। সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামীদ ইয়াং তুর্কসের নেতা মিদহাত পাশাকে উযীরে আযম নিযুক্ত করেন। খৃস্টীয় ১৮৭৬ সনে সুলতান ফরমানের মাধ্যমে তুর্কীর জন্য একটি সংবিধান ঘোষণা করেন। কিছুকাল পর সুলতানের সাথে মিদহাত পাশার সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। সুলতান তাঁকে উযীর আযম পদ থেকে বরখাস্ত করেন। সংবিধান মুলতবী ঘোষণা করা হয়। ইয়াং তুর্কস-এর নেতৃবৃন্দ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গিয়ে নিজেদের অনুকূলে জনমত গঠনের জন্য গোপনে কাজ করতে থাকেন।

১৯০৬ সনে স্যালোনিকাতে আনোয়ার পাশার নেতৃত্বে গঠিত হয় কমিটি অব ইউনিয়ান এন্ড প্রগ্রেস। তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন তালাত পাশা ও জামাল পাশা। পরবর্তীতে এই কমিটি ইয়াং তুর্কসের সাথে মিলিত হয়ে কাজ করতে থাকে।

তুর্কীকে ইউরোপীয় ধাঁচে গঠন, শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মানবাধিকার ঘোষণা, প্রগতিশীল রাষ্ট্রগুলোর সাথে সহযোগিতা ইত্যাদি ছিলো কমিটি অব ইউনিয়ান এন্ড প্রগ্রেস-এর কর্মসূচী।

কমিটি অব ইউনিয়ান এন্ড প্রগ্রেস-এর প্রথম সরকার

১৯০৮ সনে কমিটি অব ইউনিয়ান এন্ড প্রগ্রেস-এর পক্ষ থেকে আনোয়ার পাশা মেসিডোনিয়াতে তুর্কীর জন্য একটি সংবিধান ঘোষণা করেন। সেনাবাহিনীর বিরাট অংশ আনোয়ার পাশার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। সুলতান আবদুল হামীদ কমিটি অব ইউনিয়ান এন্ড প্রগ্রেস-এর সাথে সমঝোতা করতে বাধ্য হন। তিনি উক্ত সংবিধান অনুমোদন করেন। তিনি হন রাষ্ট্রের সাংবিধানিক প্রধান। কমিটির মনোনীত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হয় উযীর পরিষদ।

বহু সংখ্যক ইসলামী ব্যক্তিত্ব-কমিটি অব ইউনিয়ান এন্ড প্রগ্রেস-এর সরকার মেনে নিতে পারেননি। এই সরকারের কার্যক্রমের মাঝে তাঁরা ইসলামের পতন দেখতে পান।

এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও তুর্কীর দুরবস্থা অব্যাহত থাকে। রণাংগনে সৈন্য বাহিনী পরাজিত হতে থাকে। এতে লোকেরা নাখোশ হয়।

কমিটির সমর্থিত পত্রিকাগুলো সুলতানকে আক্রমণ করে লেখালেখি করতে থাকে। এতে বহু লোক মানসিকভাবে আহত হয়।

সুলতানের বিশ্বস্ত কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ লোক এই সময় আততায়ীর হাতে প্রাণ হারান।

কমিটি সরকার পুরাতন অফিসারদেরকে সরিয়ে শূন্য পদে তাদের পছন্দসই ব্যক্তিদেরকে বসাতে থাকে।

সেনা বাহিনীতেও একই পলিসি অনুসরণ করা হয়। প্রায় আট হাজার সামরিক অফিসার তাঁদের পদ হারান।

নতুন অফিসারগণ সাধারণ সৈন্যদের ইসলামপ্রীতি নিয়ে হাসাহাসি করতো। দীনী কাজকর্মে বাধা দিতো। ফলে সৈনিকদের মধ্যেও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।

কমিটি অব ইউনিয়ান এন্ড প্রগ্রেস-এর দ্বিতীয় সরকার

১৯০৯ সনের এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে কনস্ট্যান্টিনোপলের সৈন্যরা অফিসারদেরকে তাঁদের ঘরে তালাবদ্ধ করে ক্যান্টনমেন্টের নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নেয়। তারা পার্লামেন্ট ভবনও দখল করে। আয়া সোফিয়া মাসজিদে সমাবেশ করে। তারা শারীয়াহর পক্ষে শ্লোগান দেয়। অবস্থা বেগতিক দেখে কমিটি অব ইউনিয়ান এন্ড প্রগ্রেস সরকার পদত্যাগ করে। কমিটির নেতৃবৃন্দ পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন।

স্যালোনিকা ছিলো কমিটি অব ইউনিয়ান এন্ড প্রগ্রেস-এর সবচে বেশী মজবুত ঘাঁটি। মাহমুদ শাওকাত পাশার নেতৃত্বে একদল সৈন্য রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা হয়। ২৪শে এপ্রিল তারা কনস্ট্যান্টিনোপল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনে। সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামীদকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। নতুন সুলতান বানানো হয় মাহমুদ রাশাদ বা পঞ্চম মুহাম্মাদকে। ১৯১৮ সনে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সুলতান ছিলেন। আবার কমিটি সরকার কায়েম হয়। মার্শাল ল জারি করা হয়। অন্য সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হয়। ইত্তিহাদ-ই-মুহাম্মাদী জামিয়াতি নামক সংস্থাটিও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

কমিটি সরকার ও ইত্তিহাদ-ই-মুহাম্মাদী জামিয়াতী

১৯০৯ সনের গোড়া দিকে হাফিয দারবিশ ওয়াহদাতি বে-র নেতৃত্বে ইত্তিহাদ-ই-মুহাম্মাদী জামিয়াতী নামে একটি সংগঠন কায়েম হয়। আয়া সোফিয়া মাসজিদে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যাত্রা শুরু হয় এই সংগঠনের। সেই অনুষ্ঠানে সাঈদ নুরসী দুই ঘন্টা বক্তৃতা করেন।

কনস্ট্যান্টিনোপলের সেনা বিদ্রোহ দমন করার পর শত শত লোক গ্রেফতার করা হয়। কমিটি অব ইউনিয়ান এন্ড প্রগ্রেস-এর বিশ্বাস ছিলো যে ইত্তিহাদ-ই-মুহাম্মাদী

জামিয়াতীর উসকানিতেই এই বিদ্রোহ ঘটে। আর যেহেতু সাঈদ নুরসী এই জামিয়াতীর সাথে জড়িত, সেহেতু তিনিও অপরাধী। এই অজুহাতে সরকার সাঈদ নুরসীকে গ্রেফতার করে।

কোর্ট মার্শালে বিচার হয় ইত্তিহাদ-ই-মুহাম্মাদী জামিয়াতীর নেতৃবৃন্দের। খৃস্টীয় ১৯০৯ সনের উনিশে জুলাই একটি কালো দিন। ঐদিন হাফিয দারবিশ ওয়াহদাতি বে ও আরো বারো জনকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানো হয়। শেষাবধি এই সংগঠনের দুইশত সাইত্রিশ জন ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়।

কোর্ট মার্শালে সাঈদ নুরসীর বিচার

বন্দী সাঈদ নুরসীকে বায়েজিদ নামক স্থানে কোর্ট মার্শালে উপস্থিত করা হয়। যেই কক্ষে তাঁর বিচার হচ্ছিলো সেই কক্ষের জানালা দিয়ে পনরজনের ঝুলন্ত লাশ দেখা যাচ্ছিলো।

কোর্ট মার্শালের প্রিজাইডিং অফিসার সাঈদ নুরসীকে বলেন, "আপনি শারীয়াহ চাচ্ছেন? যারা শারীয়াহ চায় তারা বাইরে ঝুলে থাকা ঐ লোকগুলোর মতো ফাঁসিতে ঝুলে।"

বাদীউয্যামান সাঈদ নুরসীর নির্ভীকতা ছিলো বিস্ময়কর। এই নাজুক পরিস্থিতিতেও ইসলাম বিদ্বেষী সামরিক অফিসারকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, "আমার যদি এক হাজার জীবন থাকতো, আমি শারীয়ার এক একটি অংশের জন্য আমার জীবনগুলো কুরবান করে দিতাম। কারণ শারীয়াহই হচ্ছে সমৃদ্ধি, কল্যাণ, সুবিচার ও সততার পথ।"

তিনি আরো বলেন, "বীর ব্যক্তিরা অপরাধ করে না। যদি তারা অভিযুক্ত হয় তারা শাস্তিকে ভয় পায় না। আমি যদি অন্যায়ভাবে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হই আমি দুইজন শহীদের পুরস্কার পাবো। আমি যদি জেলখানায় থাকি তবে সম্ভবত জেলখানাই হচ্ছে স্বৈরাচারী সরকারের অধীনে সবচে' বেশি আরামপ্রদ স্থান। যালিম হয়ে বাঁচার চেয়ে মাযলুম হয়ে মরা উত্তম।"

কোর্ট মার্শাল তাকে মুক্তি দেয়। কোর্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সাঈদ নুরসী প্রস্থান করেন।

সিরিয়া ও লেবানন সফর

১৯১০ সনে সাঈদ নুরসী সমুদ্র পথে তাঁর জন্মভূমিতে পৌঁছেন। বহু স্থানে লোকেরা তাঁকে দেখতে আসে। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন।

১৯১১ সনে তিনি সিরিয়া সফরে আসেন। দিমাসক শহরের উমাইয়া মাসজিদে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। প্রায় দশ হাজার শ্রোতা তাঁর বক্তৃতা শোনে। সেখান থেকে তিনি বৈরুতে যান। বৈরুত থেকে যান কনস্ট্যান্টিনোপল বা ইসতামবুল।

নতুন সুলতানের কাছে মাদ্রাসাতুয যাহ্‌রা পরিকল্পনা উত্থাপন

তাঁর মাথায় মাদ্রাসাতুয যাহরা ঘুরপাক খাচ্ছিলো। নতুন সুলতান পঞ্চম মুহাম্মাদ বা মাহমুদ রাশাদের সাথে তিনি এই বিষয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী ছিলেন।

সুলতান মাহমুদ রাশাদ ও কমিটি অব ইউনিয়ান এন্ড প্রগ্রেস সরকারের কর্তা ব্যক্তিরা ইউরোপীয় প্রদেশগুলোতে সফরে যাচ্ছিলেন। তিনিও তাঁদের সাথে যুক্ত হন। তাঁরা স্কপজি ও প্রিস্টিনা হয়ে কসোভা পৌঁছেন। কসোভাতে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিষয় আলোচনা হচ্ছিলো। এই সুযোগে সাঈদ নুরসী পূর্ব আনাতোলিয়াতে তাঁর পরিকল্পিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

১৯১২ সনে বলকান যুদ্ধে তুর্কী পরাজিত হওয়ায় কসোভাতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সম্ভাবনা রহিত হয়ে যায়।

১৯১৩ সনে সাঈদ নুরসী কসোভা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ মাদ্রাসাতুয্ যাহরা স্থাপনের জন্য বরাদ্দ করার আবেদন পেশ করেন। এই আবেদন গৃহীত হয়।

ওয়ান (van)হ্রদের তীরে ভিত্তি প্রস্তরও স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৯১৪ সনের নবেম্বর মাসে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় তাঁর পরিকল্পিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ভবন নির্মাণের কাজ স্থগিত হয়ে যায়।

রণাংগনে সাঈদ নুরসী

প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া। তুর্কী জার্মেনীর পক্ষে যোগ দেয়। এই নাজুক সময়ে যেইসব ইসলামী চিন্তাবিদের ফতোয়া মুসলিমদেরকে জিহাদী প্রেরণায় উদ্দীপিত করে তাঁদের একজন ছিলেন বাদীউয্‌যামান সাঈদ নুরসী।

সাঈদ নুরসী ছিলেন একজন কর্ম-বীর। তাই ফতোয়া দিয়েই তিনি ক্ষান্ত থাকতে পারেন নি। তিনি অনুভব করলেন উম্মাহর এই সংগীন সময়ে তাঁরও হাতিয়ার নিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত।

আনোয়ার পাশা তখন যুদ্ধ মন্ত্রী। তিনি আনোয়ার পাশার সাথে দেখা করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি মিলিশিয়া বাহিনী গড়ে তোলার অনুমতি হাছিল করেন। বাহিনী গঠন করে তিনি রণাংগনে নেমে পড়েন। বিত্‌লিস রণাংগনে তিনি

ও তাঁর মিলিশিয়া বাহিনী বীরের মতো লড়েন। কিন্তু ১৯১৬ সনের মার্চ মাসে রাশিয়ার বিশাল সেনাবাহিনী প্রচণ্ড হামলা চালিয়ে বিত্‌লিস দখল করে নেয়। সাঈদ নুরসী বন্দী হন। দুই বছর তিনি কাটান বন্দীশালায়। ১৯১৮ সনে তিনি বন্দীশালা থেকে পালিয়ে ওয়ারশ ও বার্লিন হয়ে কনস্ট্যান্টিনোপল পৌঁছেন। তাঁকে বীরোচিত সম্বর্ধনা দেয়া হয়। যুদ্ধ মন্ত্রী আনোয়ার পাশা নিজে তাঁকে অন্যান্য সামরিক অফিসারের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁকে একটি ওয়ার মেডাল দেয়া হয়।

দারুল হিকমাহ্ ইসলামীয়া ও সাঈদ নুরসী

১৯১৮ সনে ওয়াহিদ উদ্দীন সুলতান ষষ্ঠ মুহাম্মাদ নামে মসনদে বসেন।

১৯১৮ সনের ১২ই অগাস্ট সরকার দারুল হিকমাহ্ ইসলামীয়া নামে একটি সংস্থা গঠন করে। মুহাম্মাদ আকিফ এই সংস্থার সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। এই সংস্থার নয়জন সদস্যের মধ্যে সাঈদ নুরসী ছিলেন একজন।

মুসলিম জাহানের সমস্যাবলীর সমাধান চিহ্নিতকরণ, মুসলিম উম্মাহ্‌র বিরুদ্ধে পরিচালিত বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণগুলোর জবাবদান, দীন ইসলামকে হেয় করার প্রচেষ্টা প্রতিহত করণ, প্রকাশ্যে ইসলামী নৈতিকতা বিরোধী কাজ হতে দেখলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ, প্রকাশনার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবদান, আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় বিপদগুলো জনগণকে অবহিতকরণ ও তাদের দীনী প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে স্থাপিত হয়েছিলো দারুল হিকমাহ্ ইসলামীয়া। ১৯২২ সনের নভেম্বর মাসে আংকারা ভিত্তিক তুর্কীর নতুন সরকার সুলতান পদ বিলুপ্ত করে। ঐ সরকার দারুল হিকমাহ্ ইসলামীয়ার কার্যক্রমও বন্ধ করে দেয়। সংস্থাটি বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত চার বছর সাঈদ নুরসী এর সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।

জামিয়াতুল মুদাররেসীন ও সাঈদ নুরসী

১৯১৯ সনে জামিয়াতুল মুদাররেসীন নামে একটি সংগঠন গঠিত হয়। শিক্ষকতা পেশার মানোন্নয়ন, শিক্ষকদেরকে যুগপৎভাবে ইসলাম ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করণ, ভ্রাতৃত্ব বোধ দৃঢ়করণ, শিক্ষকদের অধিকার সংরক্ষণ ইত্যাদি ছিলো এই সংগঠনের লক্ষ্য। সাঈদ নুরসী এই সংগঠনের একজন নিষ্ঠাবান সদস্য ছিলেন।

গ্রীন ক্রিসেন্ট সোসাইটি ও সাঈদ নুরসী

১৯২০ সনের প্রথমভাগেই শাইখুল ইসলাম ইবরাহীম আফিন্দী, ডঃ তাওফীক রুসতু আরাস, আশরাফ এদিপ, ফাখরুদ্দীন করীম গোকে ও সাঈদ নুরসীর উদ্যোগে গ্রীন ক্রিসেন্ট সোসাইটি গঠিত হয়।

ইতিমধ্যে তুর্কীর বিস্তৃত অঞ্চলে এমন কি রাজধানী কনষ্ট্যান্টিনোপলে ইউরোপীয় দখলদার বাহিনীর কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। দখলদার শক্তিগুলো মুসলিম যুবকদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেংগে দেয়ার জন্য সর্বত্র মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য ছড়িয়ে দিচ্ছিলো। এই চক্রান্ত প্রতিহত করার উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়েছিলো গ্রীন ক্রিসেন্ট সোসাইটি। সাঈদ নুরসী এর সদস্য হিসেবে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধে তুর্কীর পরাজয়ের গ্লানি

প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মেনী ও তুর্কী পরাজিত হয়। ১৯২০ সনের ১০ই অগাস্ট বিজয়ী শক্তিগুলো সেভার্স চুক্তির মাধ্যমে তুর্কীর ওপর চরম আঘাত হানে। চুক্তি অনুযায়ী ঈজিয়ান সাগরের কয়েকটি দ্বীপ ও থ্রেস তুর্কীর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে গ্রীসকে দেয়া হয়। মিসর, সুদান, সাইপ্রাস, ইরাক, ফিলিস্তিন ও আরব উপদ্বীপ গ্রেটবৃটেনের কর্তৃত্বাধীনে দেয়া হয়। লেবানন, সিরিয়া, মরক্কো, তিউনিসিয়া প্রভৃতি তুলে দেয়া হয় ফ্রান্সের হাতে। কনষ্ট্যান্টিনোপল ও আলেকজান্দ্রিয়া নৌবন্দর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে নেয়া হয়। তুর্কীর বিমান বহর মিত্র শক্তির হাতে চলে যায়। সুলতান ষষ্ঠ মুহাম্মাদের হাতে থাকে রাজধানী কনষ্ট্যান্টিনোপল ও আনাতোলিয়ার পার্বত্যাঞ্চল। তবে কনষ্টান্টিনোপলেও মিত্র বাহিনীর সৈন্যরা অবস্থান গ্রহণ করে।

সুলতান ষষ্ঠ মুহাম্মাদ দখলদার বাহিনীর হাতের পুতুলে পরিণত হন। কমিটি অব ইউনিয়ান এণ্ড প্রগ্রেস সরকারের পতন ঘটে। সুলতান সকল ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন।

আংকারাতে সমান্তরাল সরকার গঠন

আনাতোলিয়া ছিলো ইয়াংতুর্কসের শক্ত ঘাঁটি। সেখান থেকে ইয়াং তুর্কস ইউরোপীয় শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। স্মার্না রক্ষা করতে না পারায় তারা সুলতান ষষ্ঠ মুহাম্মাদের কড়া সমালোচনা করে। তারা কনষ্ট্যান্টিনোপল সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন রিফাত রউফ বে ও আলী ফুয়াদ পাশা।

এই নাজুক পরিস্থিতিতে তুর্কীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ রাজনৈতিকভাবে দুইটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এক ভাগের মত ছিলো, দখলদার শক্তিগুলোর সাথে সহযোগিতা করে তুর্কীর স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা চালানো। অপর ভাগের মত ছিলো, আনাতোলিয়া থেকে পরিচালিত আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে একে শক্তিশালী করে তোলা। বাদীউয্যামান সাঈদ নুরসী ছিলেন দ্বিতীয় মত অবলম্বনকারীদের একজন।

১৯১৯ সনে আনাতোলিয়াতে ইয়াং তুর্কস প্রতাপশালী হয়ে উঠলে তাদেরকে দমন করার জন্য সুলতান ষষ্ঠ মুহাম্মাদ সেনাবাহিনীর জাঁদরেল অফিসার মুসতাফা কামাল পাশাকে ইন্‌স্‌পেক্টার জেনারেল নিযুক্ত করে সেখানে পাঠান। সেখানে গিয়ে মুস্‌তাফা কামাল পাশা বিদ্রোহীদের দলে ভিড়ে যান।

ঐ বছরই সেপ্টেম্বর মাসে ইয়াং তুর্কস সেখানে একটি নির্বাহী পরিষদ গঠন করে। মুস্‌তাফা কামাল পাশা হন এই পরিষদের চেয়ারম্যান। সদস্য ছিলেন রিফাত রউফ বে, বেকীর সামী বে, রুস্তম বে, মাজহার বে ও হায়দার বে।

এই নির্বাহী পরিষদ আংকারাকে রাজধানী করে আনাতোলিয়া শাসন করতে থাকে। এই ভাবে আংকারায় কনষ্ট্যান্টিনোপলের সমান্তরাল সরকার কায়েম হয়ে যায়।

১৯২০ সনের এপ্রিল মাসে মুস্‌তাফা কামাল পাশা সাম্প্রতিক কালে নির্বাচিত ও সুলতান ষষ্ঠ মুহাম্মাদ কর্তৃক ভেংগে দেয়া পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করেন আংকারাতে। পার্লামেন্টের নাম দেয়া হয় গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল এসেম্বলী। মুস্‌তাফা কামাল পাশা এই এসেম্বলীরও চেয়ারম্যান হন।

আংকারা সরকার ঘোষণা করে যে বিদেশী সৈন্যদের হাতে বন্দী সুলতান ষষ্ঠ মুহাম্মাদের কোন বিধিবিধান মানা যাবে না। সুলতানের স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলোও তুর্কদের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়।

১৯২০ সনেই মুস্‌তাফা পাশার নেতৃত্বে তুর্ক সৈন্যগণ স্মার্না থেকে গ্রীক সৈন্যদেরকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়।

১৯২১ সনে সাকারিয়া রণাংগনেও গ্রীকদেরকে পরাজিত করা সম্ভব হয়।

এই দুইটি সামরিক বিজয় আংকারা সরকারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করে। কমিউনিষ্ট রাশিয়া আংকারা সরকারকে প্রথম স্বীকৃতি দেয়। ফ্রান্স এই সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে সিলিসিয়া থেকে সৈন্য সরিয়ে নেয়। ইতালী এই সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে আদালিয়া ছেড়ে চলে যায়।

খৃষ্টীয় ১৯২২ সনে গ্রীস স্মার্ণার ওপর থেকে তার দাবি প্রত্যাহার করে।

কনষ্ট্যান্টিনোপলে আংকারা সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

ঐ বছর আংকারা সরকার 'সুলতান' পদ বিলুপ্তির ঘোষণা দেয়। 'খালীফাহ' পদবীটি তখনো বহাল রাখা হয়। ষষ্ঠ মুহাম্মাদ (সুলতান ওয়াহিদ উদ্দীন) কনষ্ট্যান্টিনোপল ছেড়ে গ্রেট বৃটেন চলে যান। রিফাত পাশা আংকারা সরকারের পক্ষে কনষ্ট্যান্টিনোপলের শাসনভার গ্রহণ করেন। গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল এসেম্বলী দ্বিতীয় আবদুল মাজিদকে নামকাওয়াস্তে খালীফাহ নির্বাচিত করে।

আকাংকারাতে সাঈদ নুরসীর সংবর্ধনা

ইয়াং তুর্কস আন্দোলনের সাথে সাঈদ নুরসীর সম্পৃক্ততা ও সমর্থনের কথা মুস্তাফা কামাল পাশা ভালো করেই জানতেন। তিনি তাঁকে আংকারা যাবার জন্য বারবার অনুরোধ জানান। শেষাবধি সাঈদ নুরসী আংকারা পৌঁছেন।

১৯২২ সনের ৯ই নভেম্বর গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল এসেম্বলীতে তাঁকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়।

মুস্তাফা কামাল পাশার মুখোমুখি

১৯২৩ সনের ১৯শে জানুয়ারী সাঈদ নুরসী দশ দফা দাবি সম্বলিত একটি চিঠি গ্যাণ্ড ন্যাশনাল এসেম্বলীর সদস্যদের নিকট পাঠান। এই চিঠির মাধ্যমে তিনি সকলকে দীনী কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ করে দেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার সুফল ফলতে শুরু করে। আগে সালাত আদায় করতো না এমন প্রায় ৬০ জন সদস্য অন্যান্য নামাযী সদস্যদের সাথে যোগ দেন। সালাত আদায়ের জন্য নির্ধারিত রুমে আর জায়গা হচ্ছিলো না। ফলে আরো বড়ো একটি রুমে জামায়াতের ব্যবস্থা করা হয়।

এসেম্বলীর চেয়ারম্যান মুস্তাফা কামাল পাশা এই তৎপরতা দেখে বিরক্ত হন। একদিন তিনি রাগতস্বরে সাঈদ নুরসীকে বলেন, "আমাদের প্রয়োজন একজন বীর আলিমের। আপনার উন্নত চিন্তাধারা থেকে উপকৃত হবার জন্যই আপনাকে এখানে ডেকে আনা হয়েছে। অথচ আপনি এখানে এসে সালাত সম্পর্কে লেখালেখি শুরু করলেন। এইভাবে আমাদের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টি করলেন।"

সাঈদ নুরসী নির্ভীকভাবে জবাব দিলেন, "পাশা, পাশা, ঈমানের পর ফারয সালাতগুলোইতো ইসলামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যারা সালাত আদায় করে না তারা বিশ্বাসঘাতক। আর বিশ্বাসঘাতকের অভিমত গ্রহণ করা যায় না।"

উপস্থিত সকলেই ঘাবড়ে গেলেন। তাঁরা ভাবলেন, এই সব উক্তির জন্য সাঈদ নুরসীকে চড়ামূল্য দিতে হবে।

কিন্তু চতুর মুস্তাফা কামাল পাশা নিজের রাগ সামলে নিলেন। দুই দিন পর তিনি সাঈদ নুরসীকে তাঁর অফিসে ডেকে নেন ও বিভিন্ন বিষয়ে দুই ঘন্টা আলাপ করেন। তিনি সাঈদ নুরসীকে মাসিক তিনশত লিরার বিনিময়ে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে মুবাল্লিগ হিসেবে কাজ করার প্রস্তাব দেন, তাঁকে এসেম্বলীতে সদস্য পদ দিতে চান ও দারুল হিকমাহ ইসলামীয়ার সদস্য পদের অনুরূপ একটি পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেন। সাঈদ নুরসী এইসব পদ প্রত্যাখ্যান করেন।

মুস্তাফা কামাল পাশার স্বৈর শাসন

আংকারাতে অবস্থানকালে সাঈদ নুরসী বুঝতে পেরেছিলেন তুর্কীর মুসলিমদের

ওপর নতুন কী আপদ জেঁকে বসেছে। ১৯২৩ সনের এপ্রিল মাসে তিনি আংকারা ত্যাগ করে ওয়ান (van) চলে আসেন।

১৯২৩ সনের অক্টোবর মাসে মুস্‌তাফা কামাল পাশা তুর্কীকে একটি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে তিনি এর প্রেসিডেন্ট হন ও ইসমত ইনুনুকে প্রাইম মিনিষ্টার বানান।

১৯২৪ সনে একটি আইনের মাধ্যমে "খালীফাহ" পদ বিলুপ্ত করেন। নামকাওয়াস্তে খালীফা দ্বিতীয় আবদুল মাজিদ পদচ্যুত হন। কামাল পাশা তুর্কীকে একটি সেকুলার রাষ্ট্রে পরিণত করেন। তুর্কীর রাজধানী কনষ্ট্যান্টিনোপল থেকে আংকারা স্থানান্তরিত হয়।

মুস্‌তাফা কামাল পাশা চরম ইসলাম বিদ্বেষী ছিলেন। যা কিছু ইসলামী আইন তখনো প্রচলিত ছিলো সেইগুলো বাদ দিয়ে তিনি সুইস কোড (Swiss Code) প্রবর্তন করেন।

তিনি পর্দা প্রথার বিলোপ সাধন করেন। একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ করেন। সহশিক্ষা প্রবর্তন করেন।

ইসলামী শিক্ষালয়গুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। দেশের সর্বত্র সেকুলার স্কুল-কলেজ স্থাপিত হয়। আরবীতে আযান দেয়া নিষিদ্ধ হয়। আরবী বর্ণমালার পরিবর্তে ল্যাটিন বর্ণমালা চালু করা হয়। পাগড়ি ও ফেজ টুপি পরা নিষিদ্ধ হয়। হ্যাট পরিধান বাধ্যতামূলক করা হয়। সালাম পরিত্যক্ত হয়।

দেশে সেকুলার পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সেকুলার ও সমাজতান্ত্রিক বই-পুস্তক ব্যাপকহারে প্রকাশিত হতে থাকে। যুব সমাজ উচ্ছৃংখল হয়ে উঠে। বেহায়াপনা-উলংগপনা বৃদ্ধি পায়। মদখোরের সংখ্যা বাড়তেই থাকে।

ইসলামকে নিয়ে বিদ্রূপ হতে থাকে। আলিম সমাজ ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়। বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিদেরকে নানাভাবে নির্যাতিত করা হয়।

১৯৩০ সনে মুস্‌তাফা কামাল পাশা রিপাবলিকান পিপলস পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ১৯৪৬ সন পর্যন্ত এটিই ছিলো তুর্কীর একমাত্র বৈধ রাজনৈতিক দল।

সাঈদ নুরসীর নতুন উপলব্ধি

সাঈদ নুরসীর বয়স তখন তেতাল্লিশ বছর। প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কষ্ট, বন্দী জীবনের ধকল ও বিরামহীন পরিশ্রম তাঁর দেহের ওপর দারুণ প্রভাব ফেলে।

বিভিন্ন রণাংগনে খৃষ্টান শক্তিগুলোর নিকট তুর্কীর পরাজয় এবং তুর্কীর ওপর

ইউরোপের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন বাদীউয্‌যামান সাঈদ নুরসীর ওপর দারুণ মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। ফলে তাঁর স্বাস্থ্য বেশ ভেংগে পড়ে। তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি লক্ষ্য করে তাঁর ভাইয়ের ছেলে আবদুর রাহমান কারণ জানতে চান। জবাবে সাঈদ নুরসী বলেন, "আমি আমার নিজের দুঃখগুলো সইতে পারি। কিন্তু ইসলামের দুঃখ আমাকে বিধ্বস্ত করে ফেলেছে। ইসলামী দুনিয়ার ওপর প্রদত্ত প্রতিটি আঘাত আমার অন্তরের ওপর হানা হয় বলে আমি অনুভব করি। তাই আমি এমন ভেংগে গেছি। তবে আমি একটি আলো দেখতে পাচ্ছি। ইনশাল্লাহ সেই আলো দুঃখগুলো ভুলিয়ে দেবে।"

বাদীউয্‌যামান সাঈদ নুরসী দার্শনিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিলো, দার্শনিক জ্ঞান আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান। কিন্তু শীঘ্রই তিনি অনুভব করেন যে আসলে ব্যাপারটি তা নয়।

এই সময় তিনি আবদুল কাদির জিলানীর (রহ) "ফুতুহুল গাইব" গ্রন্থটি পড়েন। এর পর তিনি পড়েন শায়খ আহমাদ সরহিন্দীর (রহ) "মাকতুবাত"। এই অধ্যয়ন তাঁর চিন্তার দিগন্ত আরো প্রসারিত করে।

সন্দেহ নেই, গোড়া থেকেই আল কুরআনই ছিলো তাঁর প্রধান অবলম্বন। এবার তিনি আরো বেশী অভিনিবেশ সহকারে আল কুরআন পড়তে থাকেন। আল কুরআন তাঁকে আরো বেশী আলো দিতে থাকে। জীবন ও জগতের রহস্যগুলো তাঁর কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠে। আল কুরআনের বিধানগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব, বলিষ্ঠতা ও কল্যাণময়তা তাঁর ইসলামী চিন্তা-চেতনাকে আরো বেশী শক্তিশালী করে তোলে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, তাঁর এই উপলব্ধি তিনি "রিসালা-ই-নূর" শীর্ষক পুস্তিকা সিরিজের মাধ্যমে অপরাপর মানুষের কাছে উপস্থাপন করবেন।

মাউন্ট এরেকে অবস্থান

আংকারা থেকে ওয়ান এসে সাঈদ নুরসী প্রথমে তাঁর ছোট ভাই আবদুল মাজীদের বাসায় উঠেন। কিন্তু তাঁর কাছে বহু সংখ্যক লোক আসা-যাওয়া করতে থাকায় তিনি নুরসিন মাসজিদে স্থানান্তরিত হন। এই মাসজিদ এবার তাঁর ইসলামী জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

কিছুকাল পর তিনি মাউন্ট এরেক চলে যান ও সেখানে যারনাবাদ নদীর উৎসমুখের নিকটে অবস্থান করতে থাকেন। তবে জুমাবার তিনি নুরসিন মাসজিদে এসে খুতবাহ দিতেন। তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখতেন। তাঁর এক ছাত্র মোল্লা হামীদের প্রশ্নের

উত্তরে তিনি বলেন, "আমার লক্ষ্য হচ্ছে ঈমানের বুনিয়াদ মজবুতভাবে গড়ে তোলা। যদি বুনিয়াদ মজবুত হয়, কোন তুফানেই তা ভেংগে পড়বে না।"

মাউন্ট এরেকে তিনি একটি মাসজিদ নির্মাণ করেন। কাছে গাছ-গাছালির মধ্যে ছোট একটি মঞ্চ তৈরি করেন। এখানে বসে তিনি পড়াশুনা ও চিন্তা-গবেষণা করতেন।

রাতে তিনি সালাতুত্ তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। দীর্ঘ সময় ধরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট দুআ করতে থাকতেন।

সশস্ত্র তৎপরতার বিরোধিতা

সাঈদ নুরসী তখন প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে অবস্থান করছিলেন। তবুও বিভিন্ন গোত্রের সরদার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁর নিকট আসা-যাওয়া করতো।

কুর্দদের মধ্যে অনেকেই সরকার-বিরোধী হয়ে উঠে। সরকারের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ তাদেরকে ব্যথিত করে। অন্য দিকে তাদের অঞ্চলের সমস্যাবলী সমাধানের প্রতি সরকারের উদাসীনতা তাদেরকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। জনৈক শায়খ সাঈদ এই সময় সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি সশস্ত্র গ্রুপ গড়ে তোলেন। হুসাইন পাশা নামক একজন সরদার সাঈদ নুরসীর সাথে সাক্ষাত করে বলেন, "আমার সৈন্য, ঘোড়া, অস্ত্র, গোলাবারুদ প্রস্তুত। আমরা শুধু আপনার কমাণ্ড অপেক্ষা করছি।"

সাঈদ নুরসী বললেন, "আপনারা কার বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান।" হুসাইন পাশা বললেন, "মুস্তাফা কামালের বিরুদ্ধে।" সাঈদ নুরসী বললেন, "মুস্তাফা কামালের সৈন্যরা কারা?" হুসাইন পাশা বললেন, "আমি তা জানিনা।" সাঈদ নুরসী বললেন, "ওরা এই দেশেরই ছেলে। ওরা আমার আত্মীয়-স্বজন, আপনার আত্মীয়-স্বজন। আপনি কাদেরকে হত্যা করবেন? তারা কাকে হত্যা করবে? মাথা ঘামান। আপনি কি চান আহমাদ মুহাম্মাদকে আর হাসান হুসাইনকে হত্যা করুক?"

সাঈদ নুরসী সরকার পরিবর্তনের জন্য সশস্ত্র তৎপরতা চালানোর ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি তাঁর শানিত যুক্তি ব্যবহার করে ঐ ধরণের তৎপরতায় আগ্রহী ব্যক্তিদেরকে নিরুৎসাহিত করে চলেন। তথাপিও আবেগ প্রবণ ও ত্বরা প্রবণ লোকেরা ঐ দিকেই ঝুঁকে পড়ে।

১৯২৫ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারী শায়খ সাঈদের নেতৃত্বে সশস্ত্র লড়াই শুরু হয়। রাষ্ট্রশক্তির মুকাবিলায় এইটি ছিলো একটি অপ্রতুল প্রয়াস। মুস্তাফা কামাল পাশার সৈন্যরা অভিযান চালিয়ে দুই মাসের মধ্যেই এই বিদ্রোহ দমন করে।

বিদ্রোহ দমনের পর ইনডিপেনডেন্স ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়। বিচারের নামে প্রহসন করা হয়। বহু লোককে শাস্তি দেয়া হয়।

সরকার ওয়ান প্রদেশের প্রভাবশালী ইসলামী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরকে গ্রেফতার করে। একদল সৈন্য এসে যারনাবাদ নদীর উৎসের নিকটবর্তী নিভৃত স্থান থেকে সাঈদ নুরসীকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। শায়খ মাসূম, কুর হুসাইন পাশা, হাসান আফিন্দী, আবদুল বাকী আফিন্দী, আবদুল্লাহ আফিন্দীসহ কয়েকশত পুরুষ ও মহিলাকে প্রথমে ইজমির ও পরে আন্টালিয়া নিয়ে যাওয়া হয়।

সাঈদ নুরসীর নির্বাসন

(ক) বুরদুর ঃ

আন্টালিয়া থেকে সাঈদ নুরসীকে আনাতোলিয়ার বুরদুর নামক স্থানে নির্বাসনে পাঠানো হয়।

একটি ছোট্ট শহর বুরদুর।

১৯২৫ সনের জুন মাসে তিনি বুরদুর পৌঁছেন। হাজী আবদুল্লাহ মাসজিদে তাঁকে থাকতে দেয়া হয়। এই মাসজিদে তিনি প্রত্যেক দিন সালাতুল আছরের পর দারস দিতেন। ক্রমশঃ শ্রোতার সংখ্যা বাড়তে থাকে।

(খ) ইসপারটা ঃ

সাঈদ নুরসীর দারস প্রদান সরকারের মনঃপূত ছিলো না। তাই ১৯২৬ সনের জানুয়ারী মাসে তাঁকে ইস্পারটা পাঠিয়ে দেয়া হয়। ওখানে তিনি তাহসিন আফিন্দী মাদ্রাসাতে অবস্থান করতে থাকেন। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি দারস প্রদান শুরু করেন।

(গ) বারলা ঃ

ইস্পারটাতে থেকে এইভাবে দারস দিতে থাকায় ও বহু লোক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকায় সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ইস্পারটায় তিনি মাত্র বিশ দিন ছিলেন। এবার সরকার তাঁকে নৌকায় চড়িয়ে ইগ্রিদির হ্রদের তীরে একটি ছোট্ট গ্রাম বারলাতে নির্বাসিত করে। তখনো ঐ গ্রামে যাওয়ার পথ তৈরি হয়নি। বিদ্যুৎ পৌঁছেনি। টেলিফোন লাইন স্থাপিত হয়নি।

বারলাতে সাঈদ নুরসী প্রথমে মুহাজির হাফিয আহমাদের বাড়িতে অবস্থান গ্রহণ করেন। পরে তিনি দুই কক্ষ বিশিষ্ট একটি ঘরে স্থানান্তরিত হন। এই ঘরটি এর আগে গ্রামের লোকদের মিলনায়তন হিসেবে ব্যবহৃত হতো। প্রকৃত পক্ষে এই বাড়িটিই প্রথম নূর মাদ্রাসায় পরিণত হয়।

সাঈদ নুরসীকে বারলাতে থাকতে হয় সাড়ে আট বছর। এই সময়ে তিনি রিসালা-ই-নূরের একশত ত্রিশটি অংশ লিখতে সক্ষম হন। আল কুরআনের উপস্থাপিত জীবন দর্শন ও জীবন-বিধান সম্পর্কে গণ মানুষকে অবহিত করার সুমহান লক্ষ্য সামনে নিয়ে তিনি এই প্রয়াস চালাতে থাকেন। বিজ্ঞান, দর্শন ও সভ্যতার নামে ইসলামের বিরুদ্ধে যেইসব আক্রমণ চালানো হচ্ছিলো তিনি সেইগুলোর জবাব লিখতে থাকেন।

তাঁর নিজের হাতের লেখা খুব ভালো ছিলো না। তবে হাতের লেখা ভালো এমন কয়েকজন ছাত্রকে বসিয়ে দিয়ে মুখে তাঁর বক্তব্য বলতে থাকতেন। ছাত্রগণ তা লিখে নিতো।

তখন ইসলামী বই-পুস্তক মুদ্রণ করা অসম্ভব ব্যাপার ছিলো। তাই তাঁর পুস্তিকাগুলো মুদ্রণের কোন সুযোগ ছিলো না। অথচ যাদের জন্য এইগুলো লেখা তাদের কাছে তো পৌঁছানো প্রয়োজন।

তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, প্রথমে যারা কপি তৈরি করবে তারা আরো কিছু লোকের নিকট ঐগুলো পৌঁছাবে। ঐ লোকেরা নতুন কপি তৈরি করে পৌঁছাবে আরো কিছু লোকের নিকট। এইভাবে এইগুলোর কপির পর কপি তৈরি হতে থাকবে। অল্প সময়ের মধ্যে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, শহর থেকে শহরান্তরে রিসালা-ই-নূরের কপি পৌঁছে যায়। শুধু ইস্পারটাতেই পাঠকের সংখ্যা কয়েক হাজারে পৌঁছে। এইসব পাঠকদের মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন ছিলো যারা একাধারে সাত আট দিন ঘরে বসে রিসালা-ই-নূর কপি করে চলতো।

রিসালা-ই-নূর কপি করার কাজে মহিলাদের অবদানও কম ছিলো না। বালক-বালিকারাও তাদের আব্বা-আম্মার সাথে বসে রিসালা কপি করতো। অনুমান করা হয়, এইভাবে হাতে লেখা রিসালা-ই-নূরের কপি সংখ্যা ছয় লাখে পৌঁছেছিলো।

সাঈদ নুরসী চাচ্ছিলেন ইসলাহ। যাঁরা এই কাজে প্রকৃত ভূমিকা পালন করতে পারতেন তাঁরা ছিলেন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ও এসেম্বলীর সদস্যবৃন্দ। সাঈদ নুরসী কিছু কপি তাঁদের নিকট পৌঁছাতে সক্ষম হন।

তবে সরকারের বৈরী মনোভাবের কারণে রিসালা-ই-নূর কপি করণ ও বিতরণ সহজ কাজ ছিলো না। সন্দেহ হলেই পুলিশ লোকদের বাড়িতে হানা দিতো। কারো কাছে কপি পাওয়া গেলে তাকে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতো। মারধোর করতো। কাউকেও বা বন্দী করে রাখতো।

রিসালা-ই-নূর একদিকে আল কুরআনের শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রেখেছে অন্য দিকে বাঁচিয়ে রেখেছে আল কুরআনের বর্ণমালাকে।

রিসালা-ই-নূরের প্রভাব বেড়েই চলে। রিসালা-ই-নূরের প্রভাবে নীরবে সৃষ্টি হতে থাকে ইসলামী জাগরণ।

১৯৩৫ সনের ২৭শে এপ্রিল সাঈদ নুরসী ও তাঁর একদল অনুগামীকে ইস্‌পারটা থেকে গ্রেফতার করা হয়। কয়েকদিনের মধ্যে মিলাস, আন্তালিয়া, বলভাদিন, আইডিন, ওয়ান ও অন্যান্য স্থান থেকে রিসালা-ই-নূরের বহু সংখ্যক পাঠককে গ্রেফতার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার জন্য জনগণের ধর্মীয় আবেগের ব্যবহার ও ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংস্থা গড়ে তোলার অভিযোগ আনা হয়। পত্রিকাতে অপপ্রচার চালানো হতে থাকে যে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর একটি নেটওয়ার্কের সন্ধান পাওয়া গেছে।

(ঘ) এসকিশেহির ঃ

১৯৩৫ সনের ১২ই মে সাঈদ নুরসী ও তাঁর অনুগামী ৩১ জন ব্যক্তিকে হ্যাণ্ডকাপ লাগিয়ে লরিতে তুলে এসকিশেহির নিয়ে আসা হয়। জেলখানায় সাঈদ নুরসীকে একটি কক্ষে ও ৩১ জনকে একটি ওয়ার্ডে রাখা হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই বন্দীদের সংখ্যা হয় একশত বিশজন। বন্দীদেরকে বারটি দিন খাদ্য দেয়া হয়নি। অত্যন্ত কষ্টদায়ক পরিবেশে তাঁদেরকে থাকতে বাধ্য করা হয়।

জেলখানায় তাঁরা জামায়াতে সালাত আদায় করতেন। পারা ভাগ করে নিয়ে দৈনিক কয়েকবার আল কুরআন অধ্যয়ন সমাপ্ত করতেন। সমবেতভাবে আল্লাহর দরবারে দুআ করতেন।

কারাগার কার্যতঃ শিক্ষাগারে পরিণত হয়। সাঈদ নুরসী ইউসুফ (আ) এর তৎপরতার অনুরূপ তৎপরতার নিরিখে জেলখানাকে মাদ্রাসা-ই-ইউসুফিয়া বলে উল্লেখ করতেন।

এসকিশেহির কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। সাঈদ নুরসীকে এগার মাস ও পনরজন অনুগামীকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়। অন্যরা মুক্তি পায়। এই রায় প্রদান করা হয় ১৯৩৫ সনের ১৯শে অগাস্ট। ১৯৩৬ সনের মার্চ মাসে সাঈদ নুরসী এসকিশেহির জেলখানা থেকে মুক্তি পান।

(ঙ) কাসতামনু ঃ

সাঈদ নুরসীকে এবার নির্বাসিত করা হয় কাসতামনুতে। প্রথম তিন মাস তাঁকে থানাতেই একটি কক্ষে কাটাতে হয়। পরে থানার বিপরীত দিকে একটি ভাড়া করা বাড়িতে তিনি থাকা শুরু করেন।

কাসতামনুতে শীতকালে তীব্র শীত পড়ে। শীতের প্রচণ্ডতায় তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি বাত রোগে ভুগতে থাকেন। তবে তাঁর কলম চলতে থাকে বিরামহীন। আরো কিছু রিসালা-ই-নূর তিনি লিখতে সক্ষম হন।

পুলিশের হয়রানি সত্বেও লোকেরা তাঁর সাথে দেখা করতে আসতো। তিনি রিসালা-ই-নূরের পাঠক বা ছাত্রদেরকে তাকওয়া অবলম্বনের উপদেশ দিতেন। আত্মম্ভরিতা পরিহার করতে বলতেন। তিনি বলতেন যে কারো সাথে ভালোবাসা হবে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য, আবার কারো সাথে শত্রুতা হবে আল্লাহ্‌রই জন্য।

রিসালা-ই-নূর দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে যেতে থাকে। সাঈদ নুরসী বলতেন যে এই আলো ভবিষ্যতের দিকে ছুটে যাবে।

তিনি যখন এসকিশেহির নির্বাসনে তখন ১৯৩৮ সনে প্রেসিডেন্ট মুস্তাফা কামাল পাশার মৃত্যু হয়। নতুন প্রেসিডেন্ট হন ইসমত ইবুনু। তিনিও মুসতাফা কামাল পাশার পদাংক অনুসরণ করেন।

(চ) ডেনিযলি ঃ

১৯৪৩ সনের ২রা সেপ্টেম্বর তাঁর বাসস্থানে তল্লাশী চালিয়ে পুলিশ রিসালা-ই-নূরের কিছু পাণ্ডুলিপি পায়। তাঁকে গ্রেফতার করে ডেনিযলি পাঠিয়ে দেয়া হয়। তাঁর ১২৬ জন অনুগামীকেও গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্য থেকে ৭৩ জনকে জেলে পাঠিয়ে, অন্যদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়।

সাঈদ নুরসীকে রাখা হয় ছোট্ট একটি কক্ষে। কক্ষটি এতোই ছোট্ট ছিলো যে অতি কষ্টে সেখানে তাঁর বিছানা পাতা সম্ভব হয়। খুবই ছোট্ট একটি জানালা ছাড়া আলো-বাতাস ঢোকার আর কোন পথ ছিলো না। কক্ষটি এতোই অন্ধকার ছিলো যে পড়াশুনার জন্য দিনের বেলাও মোমবাতি জ্বালাতে হতো।

এসকিশেহির জেলখানার মতো ডেনিযলি জেলখানাও ইসলামী শিক্ষাগারে পরিণত হয়। এইটি পরিণত হয় দ্বিতীয় মাদ্রাসা-ই-ইউসুফিয়ায়।

এসকিশেহির কোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে যেইসব অভিযোগ আনা হয়েছিলো সেই ধরনের অভিযোগই আনা হয়েছিলো ডেনিযলি কোর্টে। অভিযোগে বলা হলো, তিনি নতুন এক সুফী তারীকাহ তৈরি করছেন, রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলছেন, সরকারের সংস্কার কর্মসূচীর বিরোধিতা করছেন, ধর্মীয় আবেগ কাজে লাগিয়ে জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করে তুলছেন ইত্যাদি।

সাঈদ নুরসী সবগুলো অভিযোগের দাঁত ভাংগা জবাব দেন।

১৯৪৪ সনের ১৬ই জুন ডেনিযলি কোর্ট সাঈদ নুরসী ও তাঁর অনুগামীদেরকে মুক্তির আদেশ সম্বলিত রায় দেয়। সরকার ডেনিযলি কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আংকারা আপীল কোর্টে মামলা নিয়ে যায়। আংকারা আপীল কোর্ট ডেনিযলি কোর্টের রায় বহাল রাখে।

সাঈদ নুরসী জেলখানা থেকে বেরিয়ে দেখেন অগনিত মানুষ তাঁকে দেখার জন্য অপেক্ষমান। স্থানীয় লোকেরা তাঁর কারামুক্ত সাথীদেরকে মেহমান হিসেবে ভাগ করে নেয়। সাঈদ নুরসী উঠেন সাহির হোটেলে। প্রতিদিন গড়ে পাঁচশত লোক তাঁর সাথে দেখা করতে আসতো। স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হচ্ছিলো যে রিসালা-ই-নূর ডেনিযলি দখল করে নিয়েছে।

(ছ) আফিওন ঃ

আংকারা থেকে নির্দেশ আসে সাঈদ নুরসীকে আফিওন পাঠিয়ে দিতে। ১৯৪৪ সনের ৩১শে জুলাই একজন পদস্থ পুলিশ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে তিনি আফিওন পৌছেন। তাঁকে এখানে অবস্থিত আংকারা হোটেলে থাকতে দেয়া হয়। এখানে তিনি ছিলেন প্রায় তিন সপ্তাহ।

(জ) আমিরদাগ ঃ

আবার নির্দেশ আসে তাঁকে আমিরদাগ যেতে হবে। ১৯৪৪ সনের অগাস্ট মাসে তিনি আমিরদাগ পৌছেন। থানার কাছাকাছি একটি বাড়িতে তাঁকে রাখা হয়। দরজায় পাহারা বসানো হয়। তাঁর সাথে কারো সাক্ষাত করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। তবে রিসালা-ই-নূর লেখার কাজ তিনি অব্যাহত রাখেন।

উল্লেখ্য যে ডেনিযলি ট্রায়ালের পর রিসালা-ই-নূরের চাহিদা খুব বেড়ে যায়। হাতে কপি করে চাহিদা মেটানো যাচ্ছিলো না। তাঁর দুইজন শিষ্য দুইটি ডুপ্লিকেটিং মেশিন কিনে দ্রুততার সাথে কপি সরবরাহের ব্যবস্থা করে।

আমিরদাগে আসার পর সিরালা-ই-নূর রচনার কাজ কার্যতঃ সমাপ্ত হয়ে যায়।

রিসালা-ই-নূর দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সাঈদ নুরসী রিসালা-ই-নূরের কপি সরকারী কর্মকর্তাদের নিকট পাঠিয়ে দেশের সার্বিক অবস্থার নিরিখে এইগুলো বিবেচনা করতে অনুরোধ জানান। এতে ইসলাম বিরোধী শক্তি নতুনভাবে তাঁকে হয়রানি করার উদ্যোগ নেয়।

১৯৪৭ সনের শেষের দিকে কামাল পাশার উত্তরসূরী প্রেসিডেন্ট উসমত ইনুনু আফিওন সফরে আসেন। এখানে প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি বলেন, "মনে হচ্ছে এই প্রদেশে ধর্মের সাথে সম্পর্কিত একটি গোলযোগ দেখা দেবে।"

এর পরই বিভিন্ন স্থানে সাঈদ নুরসীর ছাত্রদের ওপর হয়রানি শুরু হয়। আমিরদাগে সাঈদ নুরসীর বাসস্থানে পুলিশ বারবার তল্লাশী চালাতে থাকে। ১৯৪৮ সনের শুরুতে তাঁকে বারবার থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। একবার তিনি খুবই অসুস্থ ছিলেন। তাঁর বয়সও ছিলো সত্তরের উর্ধে। এই বৃদ্ধ অসুস্থ মানুষটিকে চার

ঘন্টা দাঁড় করিয়ে রেখে যতো সব অবান্তর প্রশ্ন করা হয়।
ধৈর্যের বিমূর্ত রূপ ছিলেন সাঈদ নুরসী। পরম ধৈর্যের সাথে তিনি সব হয়রানি বরদাশত করতে থাকেন।

আবার গ্রেফতার

১৯৪৮ সনের ১৭ই জানুয়ারী তাঁকে ও তাঁর কয়েকজন অনুগামীকে আফিওন এনে প্রথমে একটি হোটেলে রাখা হয়। ২৩শে জানুয়ারী তাঁদেরকে অফিসিয়ালী গ্রেফতার করে জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। অন্যান্য স্থান থেকে আরো কিছু লোক বন্দী হয়ে আসে। মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৪ জন।
আফিওন কোর্টে "ধর্মীয় অনুভূতির ব্যবহার ও সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে উস্কানি প্রদান"-এর অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়। কোর্ট তাঁকে বিশ মাসের ও তাঁর ছাত্রদেরকে বিভিন্ন মিয়াদের কারাদণ্ড দেয়।
সাঈদ নুরসী আংকারা আপীল কোর্টে আফিওন কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল পেশ করেন।
কৌশলে এই মামলার শুনানী দীর্ঘায়িত করা হয়। আপীল কোর্টে মামলা শেষ হবার আগেই জেলখানাতে বিশ মাস সময় কেটে যায়। আপীল কোর্ট আফিওন কোর্টের রায় বাতিল করে।

তুর্কীর গণতন্ত্রে উত্তরণ

১৯৩০ সন থেকে একাধারে ১৬ বছর তুর্কীতে একদলীয় শাসন চালু থাকে। ১৯৪৬ সনে বিভিন্ন কারণে সরকার নতুন দল গঠনের অনুমতি দিতে বাধ্য হয়।
১৯৪৬ সনেই গঠিত হয় ডিমোক্রেটিক পার্টি।
১৯৫০ সনের মে মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে ডিমোক্রেটিক পার্টি জয়লাভ করে। মুসতাফা কামাল পাশা ও ইসমত ইনুনুর স্বৈর শাসনে দেশের জনগণ কেমন বিক্ষুব্ধ ছিলো এই নির্বাচনের ফল তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে।

সরকারের প্রতি উপদেশ

বাদীউয্যামান সাঈদ নুরসী প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্র নায়কদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের কর্তব্য পালন করতে ভুলেননি। ইসমত ইনুনুর শাসনকালে ১৯৪৮ সনে তিনি কমিউনিজম ও ইহুদীবাদের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে ও রাষ্ট্রের আদর্শিক বুনিয়াদ হিসেবে আল কুরআনকে গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে সরকারী কর্মকর্তাদেরকে চিঠি লিখেন।
ডিমোক্রেটিক পার্টি ক্ষমতায় আসলে তিনি সরকারকে ইসলামী নীতির নিরিখে রাষ্ট্রীয় পলিসি নির্ধারণের উপদেশ দেন।

সাঈদ নুরসী তাঁর অনুগামীদেরকেও প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে রেখেছেন। অর্থাৎ তাঁরা কেউ রাজনীতিতে জড়িত হতে চাইলে হতে পারতো, কিন্তু রিসালা-ই-নূরের প্ল্যাটফরম রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করতে পারতো না।

সাঈদ নুরসী ডিমোক্রেটিক পার্টিকে "কম মন্দ" গণ্য করতেন। ১৯৫৭ সনের নির্বাচনে তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে ডিমোক্রেটিক পার্টির পক্ষে ভোট দিতে বলেন। তিনি নতুন প্রেসিডেন্ট জালাল বায়ারকে লিখেন, "যারা রাজনীতিকে ধর্মহীনতার হাতিয়ার বানিয়ে আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছে তাদের মুকাবিলায় আমরা দীনকে রাজনীতির বন্ধু বানিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনই করছি।"

তিনি মুসলিম জাহানের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। পূর্বাঞ্চলের জন্য পরিকল্পিত বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ইসলামী ধাঁচে গড়ে তোলার জন্য তিনি আবেদন জানান। জাতীয়তাবাদ নয় ইসলামী জাতিসত্তার চেতনাকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি পরামর্শ দেন।

সাঈদ নুরসী মুসলিম জাহানের ঐক্যের ওপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি "ইউনাইটেড ইসলামিক ষ্টেটস"– এর স্বপ্ন দেখেন।

শান্তিপূর্ণ ও ইতিবাচক ভূমিকা

সাঈদ নুরসী গোটা সমাজের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি গণতন্ত্রকে সেই লক্ষ্য অর্জনের একটি বৈধ উপায় গণ্য করতেন। হঠকারী পদক্ষেপ নেয়ার জন্য তাঁকে ও তাঁর ছাত্রদেরকে নানাভাবে উসকানো হয়েছে। কিন্তু দুশমনদের ফাঁদে তাঁরা পা দেননি। "শান্তিপূর্ণ উপায়ে" "ইতিবাচক পদক্ষেপের" মাধ্যমে আল কুরআনের পথে এগিয়ে যাওয়াই ছিলো তাঁদের কর্ম কৌশল।

ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতাবাদ যেই নৈতিক আধ্যাত্মিক অবক্ষয় সৃষ্টি করেছে তার মুকাবিলায় মানুষের মনে ঈমানের আলো প্রজ্বলনকেই তিনি প্রাধান্য দেন। তাঁর জিহাদ ছিলো মুখের ভাষার জিহাদ। কলমের জিহাদ।

তাঁর দৃষ্টিভংগি ছিলো, আন্তরিকতাসহকারে ঈমানী চেতনা সৃষ্টি ও মজবুতকরণের কাজ করে যেতে হবে, আল্লাহর কাজে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। অর্থাৎ ফল লাভের জন্য তাড়াহুড়া করা যাবে না, ব্যতিব্যস্ত হওয়া যাবেনা। কেননা ফল প্রদানের বিষয়টি একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ।

আরো মামলা

দেশে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম হয়েছিলো বটে, কিন্তু ব্যুরোক্রেসি ও পুলিশ

প্রশাসনে পূর্বতন সরকারের চিন্তাধারার অনুসারীদেরই প্রাধান্য ছিলো। ফলে বার বার সাঈদ নুরসী মামলার সম্মুখীন হচ্ছিলেন।

১৯৫২ সনের জানুয়ারী মাসে ইসতাম্বুল (কনষ্ট্যান্টিনোপল) ফার্স্ট ক্রিমিনাল কোর্টে "ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বিরোধী ধর্মীয় প্রপাগ্যাণ্ডা" মূলক পুস্তিকা লেখার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। ডেনিযলি কোর্টে আগেই এই ধরনের একটি মামলা নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়ায় কোর্ট এই মামলা খারিজ করে দেয়।

১৯৫২ সনের মে মাসে আমিরদাগ কোর্টে ইউরোপীয় হ্যাট পরিধান করতে অস্বীকার করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। কোর্টের রায়ে তিনি নিষ্কৃতি পান।

১৯৫৩ সনে ইস্‌পারটা কোর্টে সাঈদ নুরসী ও তাঁর ৮৯ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে "গুপ্ত সমিতি" গঠনের অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করা হয়। কোর্ট মামলা খারিজ করে দেয়।

রিসালা-ই-নূরের পাঠচক্র

ইসপারটাতে অবস্থানকালে সাঈদ নুরসী এক গ্রুপ ছাত্রকে নিয়ে রিসালা-ই-নূরের ওপর পাঠচক্র চালু করেন। তাঁর অনুকরণে অন্যান্য অঞ্চলেও তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রগণ পাঠচক্র গড়ে তোলেন।

১৯৫৪ সনে সাঈদ নুরসী বারলা আসেন। এখানেই তো ছিলো প্রথম রিসালা-ই-নূর মাদ্রাসা। এখানে পৌঁছে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। অশ্রু গড়িয়ে পড়ে তাঁর গণ্ড বেয়ে।

রিসালা-ই-নূর মুদ্রণ

১৯৫৭ সনে আংকারা ও কনষ্ট্রান্টিনোপলে (ইসতাম্বুল) প্রিন্টিং প্রেসে প্রথম মুদ্রিত হয়ে রিসালা-ই-নূর প্রকাশিত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সাঈদ নূরসী মন্তব্য করেছিলেন, "রিসালা-ই-নূরের উৎসবের এই তো সময়। আমার কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে। এই তো সেই সময় যার জন্য আমি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছি। এবার আমি যেতে পারি।"

ব্যাপক সফর

সাঈদ নুরসী ৮০ বছর বয়সে উপনীত হন। তাঁর শরীর বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। তথাপিও আল কুরআনের মর্মকথা মানুষের কাছে পৌঁছাবার জন্য এবং রিসালা-ই-নূরের ছাত্রদেরকে সাহচর্য ও সঠিক দিক নির্দেশনা দেবার জন্য তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে সফর করতে থাকেন।

ইন্তিকাল

১৯৬০ সনে সাঈদ নুরসীর বয়স হয় ৮৩ বছর। তাঁর শরীরের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হতে থাকে। তিনি উরফা যাওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। একটি বন্ধুর পথ ধরে আমিরদাগ থেকে কয়েকজন। সাথী নিয়ে ২২শে মার্চ তিনি উরফা পৌঁছেন। তিনি একটি হোটেলে উঠেন।

পুলিশ আসে তাঁকে ইস্‌পারটা নিয়ে যেতে। কিন্তু তাঁর সাথীরা ও স্থানীয় জনগণ এই রুগ্ন ব্যক্তিটিকে কিছুতেই কোথাও নিয়ে যেতে দিতে রাজী হয়নি। ডাক্তারও জানালেন যে রোগী সফর করার অবস্থায় নেই।

রাতে তাঁর জ্বর খুব বেড়ে যায়। তিনি কথা বলার শক্তিও হারিয়ে ফেলেন।

১৯৬০ সনের ২৩শে মার্চ রাত তিনটার সময় তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের খবর শুনে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে অগনিত মানুষ ছুটতে থাকে উফরার দিকে। উলু মাসজিদে তাঁর জানাযার নামায হয়। স্থানীয় কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

অজ্ঞাত স্থানে লাস স্থানান্তর

মুসতাফা কামাল পাশার চিন্তা-ধারার অনুসারী রিপাবলিকান পিপলস পার্টি সাধারণ নির্বাচনে দুই দুইবার জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে ভিন্ন পথে ক্ষমতায় আসার চক্রান্ত শুরু করে।

এই দলটির কারসাজিতে ১৯৬০ সনের ২৭শে মে তুর্কীতে জেনারেল জামাল গুরসেলের নেতৃত্বে একটি সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। প্রেসিডেন্ট জালাল বায়ার, প্রধানমন্ত্রী আদনান মেন্দারেস, অন্যান্য মন্ত্রী ও গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল এসেম্বলীর সদস্যগণকে গ্রেফতার করে জেলে ঢুকানো হয়। উল্লেখ্য যে বিচারের নামে প্রহসনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট জালাল বায়ারকে কারাদণ্ড এবং প্রধানমন্ত্রী আদনান মেনদারেস, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ফুয়াদ যোরলু ও অর্থমন্ত্রী হাসান পোলাতকানকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। (মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় ১৯৬১ সনের ১৭ই সেপ্টেম্বর।)

প্রগাগ্যাণ্ড যুদ্ধ শুরু করা হয় রিসালা-ই-নূরের ছাত্রদের বিরুদ্ধে। তাদের ওপর নেমে আসে নিপীড়ন। সাঈদ নূরসী দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। কিন্তু বহু লোক তাঁর কবর দেখতে আসে। এটাও সহ্য হচ্ছিলো না কামাল-পন্থী সরকারের। সরকার সিদ্ধান্ত নিলো উরফা কবরস্থান থেকে তাঁর লাস তুলে নিয়ে অজ্ঞাত স্থানে দাফন করতে হবে।

১৯৬০ সনের ১২ই জুলাই।

উরফা শহরে অসংখ্য সৈন্য এসে পৌঁছে। শহরে কারফিউ দেয়া হয়। সৈন্যরা কোন লোককে ঘর থেকে বের হতে দেয়নি। কবর থেকে তাঁর লাস তুলে প্লেনে তোলা হয়। প্লেন ইস্পার্টা বিমান বন্দরে অবতরণ করলে একটি গাড়িতে করে তাঁর লাস বহু দূরে এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। আগেই একটি কবর খুঁড়ে রাখা হয়েছিলো। তাঁকে সেই কবরে শুইয়ে দেয়া হয়। তখন রাত প্রায় শেষ হয়ে আসছিলো। আজো সেই অজ্ঞাত কবরেই শুয়ে আছেন ইসলামী জাগরণের মহান পথিকৃৎ বাদীউয্যামান সাঈদ নুরসী।

উপসংহার

দূরদর্শী সাঈদ নুরসী একবার গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল এসেম্বলীর একজন সদস্যের সাথে আলাপকালে বলেছিলেন,

"আদনান মেন্দারেস দীনের একজন বলিষ্ঠ সমর্থক। দীনের জন্য তিনি অনেক কিছু করেছেন, অনেক কিছু করবেন। কিন্তু তিনি প্রত্যাশিত ফল দেখে যেতে পারবেন না। আমিও দীনের কিছু খিদমাত করেছি, এই কথা আমি গোপন করতে পারিনা। আদনান বে-র মতো আমিও প্রত্যাশিত ফল দেখে যেতে পারবো না। তবে উভয়ের প্রচেষ্টার ফল ভবিষ্যতে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে।"

তথ্যসূত্র ঃ

১. Badiuzzaman Said Nursi, Sukran Wahide

২. ইসলামের ইতিহাস, কাযী আকরাম হুসাইন

৩. মুসলিম ও আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস, কে আলী।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ)

১. জন্ম ও বংশ পরিচয়

খৃষ্টীয় ১৯০৩ সনে হিন্দুস্থানের হায়দারাবাদ রাজ্যের (বর্তমান অন্ধ্র প্রদেশ) আওরঙ্গাবাদ শহরে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আব্বার নাম সাইয়েদ আহমাদ হাসান। আম্মার নাম রুকাইয়া বেগম। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) আল হুসাইন ইবনু আলী (রা) বংশের বিয়াল্লিশ তম পুরুষ।

২. শিক্ষা জীবন

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তিন বছর বয়সেই বর্ণমালা শিখে ফেলেন। তাঁর আব্বাই ছিলেন তাঁর প্রধান শিক্ষক। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাঁকে বিভিন্ন বিষয় শেখানোর জন্য গৃহ শিক্ষকও রাখা হয়।

এগার বছর বয়সে তিনি আওরঙ্গাবাদের মাদ্রাসা ফাওকানিয়াতে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ঐ মাদ্রাসাতে ভাষার সাথে সাথে গণিত, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা ও ইতিহাস শেখানো হতো। এই শিক্ষালয়ে পড়াশুনা কালে সাইয়েদ আবুল আ'লা প্রবন্ধ লেখা ও বক্তৃতা দানে পারদর্শিতা অর্জন করেন।

১৯১৬ সনে তিনি মাদ্রাসা ফাওকানিয়া থেকে ম্যাট্রিকুলেশান মানের পরীক্ষায় পাশ করেন ও হায়দারাবাদ কলেজে ভর্তি হন। তাঁর আব্বা সাইয়েদ আহমাদ হাসান পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে ভূপালে অবস্থান করছিলেন। সাইয়েদ আবুল আ'লা তাঁর আব্বার সেবাযত্নের জন্য তাঁর আম্মাকে নিয়ে ভূপালে আসেন। তখন তাঁর কলেজ জীবনের মাত্র ছয়টি মাস অতিবাহিত হয়েছে। এই অল্প বয়সেই তাঁর ছাত্র জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই সময় প্রখ্যাত লেখক নিয়ায ফতেহপুরীর সাথে সাইয়েদ আবুল আ'লার সাক্ষাত ও পরিচয় ঘটে। তরুণ সাইয়েদ আবুল আ'লা লেখক হওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেন।

৩. কর্মজীবন শুরু

১৯১৮ সন। সাইয়েদ আবুল আ'লার বয়স তখন পনর বছর। তাঁর বড় ভাই সাইয়েদ আবুল খায়ের মওদূদী বিজনৌর থেকে প্রকাশিত মাদীনা পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তরুণ আবুল আ'লাও সম্পাদকীয় স্টাফের একজন সদস্য হিসেবে মাদীনা পত্রিকায় যোগদান করেন। কিন্তু দুই মাসের বেশী তাঁরা সেখানে থাকতে পারেননি। তাঁরা দিল্লীচলে আসেন।

১৯১৮ সনেই জব্বলপুরের জনৈক তাজউদ্দীন সাপ্তাহিক তাজ নামে একটি পত্রিকা বের করেন। সাইয়েদ আবুল খায়ের ও সাইয়েদ আবুল আ'লার ওপর এর সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে কয়েক মাস পরই পত্রিকাটি বন্ধ করে দিতে হয়। এই সময় তাঁরা কিছুকাল ভূপালে অবস্থান করে আবার দিল্লী আসেন। দিল্লীতে অবস্থান কালে সাইয়েদ আবুল আ'লা ইংরেজী ভাষা শেখেন। তিনি গভীর মনোযোগের সাথে ইংরেজী ভাষায় লিখিত দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ-বিজ্ঞানের বই-পুস্তক পড়তে থাকেন।

৪. খিলাফত আন্দোলনের তরুণ কর্মী

১৯১৪ সন থেকে ১৯১৮ সন পর্যন্ত চলে প্রথম মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধে জার্মেনীর পক্ষে যুদ্ধে নেমেছিলো তুর্কী তথা উসমানী খিলাফাহ। যুদ্ধে জার্মেনী ও তুর্কী পরাজিত হয়। যুদ্ধের পর বৃটেন ও ফ্রান্স তুর্কী তথা উসমানী খিলাফাহর বিভিন্ন অঞ্চল নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিতে থাকে। ১৯১৯ সনে বৃটিশ শাসিত উপ-মহাদেশের মুসলিমরা উসমানী খিলাফাহর অখন্ডতা অক্ষুণ্ন রাখার দাবিতে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলনেরই নাম খিলাফাত আন্দোলন।

এই আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ আলী ও তাঁর ভাই মাওলানা শাওকাত আলী। সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তরুণ ব্যারিষ্টার হুসাইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ১৯১৮ সনে গঠিত জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ খিলাফাত আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানায়। আরো সমর্থন জানায় অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস।

প্রবল বেগে এগুচ্ছিলো খিলাফাত আন্দোলনের জোয়ার। এই প্রেক্ষাপটে তাজউদ্দীন সাহেব ১৯২০ সনে জব্বলপুর থেকে আবার সাপ্তাহিক তাজ পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন। সম্পাদক নিযুক্ত হন তরুণ সাংবাদিক সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। তখন তাঁর বয়স মাত্র সতর বছর।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সাপ্তাহিক তাজ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে চলমান রাজনীতির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিলেন। খিলাফাত আন্দোলনের জোয়ার তখন জব্বলপুরেও পৌছে। তিনি আন্দোলনের বিভিন্ন তৎপরতার সাথে জড়িত হন।

জব্বলপুরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন জনসভায় তরুণ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে বক্তৃতা দিতে হয়।

৫. 'তাজ' ও 'মুসলিম' পত্রিকার সম্পাদক

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর নিরলস প্রচেষ্টায় সাপ্তাহিক তাজ পত্রিকাটি দৈনিক তাজে উন্নীত হয়।

কিন্তু দৈনিক তাজ বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। বৃটিশ বিরোধী একটি নিবন্ধ প্রকাশ করার কারণে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়।

ঐ বছর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর আব্বা সাইয়েদ আহমাদ হাসান ইন্তিকাল করেন।

১৯২০ সনের শেষভাগে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী দিল্লীতে চলে আসেন। ১৯২১ সনে তিনি পরিচিত হন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মুফতী কিফায়েতুল্লাহ ও মাওলানা আহমাদ সাঈদের সাথে। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ তখন 'মুসলিম' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশনার উদ্যোগ নেয়। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন।

দিল্লীতে অবস্থান কালে পত্রিকা সম্পাদনার ফাঁকে ফাঁকে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী প্রখ্যাত আরবী ভাষাবিদ মাওলানা আবদুস সালাম নিয়াযীর কাছে আরবী ভাষা শিখতে থাকেন। তিনি ছিলেন দারুণ পরিশ্রমী। তিনি আল কুরআনের তাফসীর, আল হাদীস, আল ফিক্‌হ ও অন্যান্য বিষয় ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেন। তরুণ বয়সেই তিনি ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধানের একজন সুপন্ডিত রূপে গড়ে উঠেন।

১৯২৩ সনে 'মুসলিম' পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ভূপাল চলে যান। কিছুকাল পর তিনি আবার দিল্লী ফিরে আসেন।

৬. উপ-মহাদেশের মুসলিমদের দুর্দিন

মোহন চাঁদ করমচাঁদ গান্ধীর অভিপ্রায়ে ১৯২০ সন থেকে চলে আসা অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস বৃটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দেয় ১৯২২ সনে। তবুও এগিয়ে চলছিলো খিলাফাত আন্দোলন।

কিন্তু ১৯২৪ সনে তুর্কীর সমরনায়ক মুসতাফা কামাল পাশা উসমানী খিলাফাহর বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। ফলে উপ-মহাদেশে বিপুল উদ্দীপনায় পরিচালিত খিলাফাত আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়ে। দারুণভাবে হতাশ হন মুসলিম জনগণ।

খিলাফাতে রাশেদা, বানু উমাইয়া খিলাফাহ ও বানুল আব্বাস খিলাফাহর পর উসমানী খিলাফাহই ছিলো দুনিয়ার মুসলিমদের শক্তির কেন্দ্র। ইউরোপের বস্তুবাদী চিন্তাধারার অনুসারী মুসতাফা কামাল পাশা খিলাফাত ব্যবস্থা বিলুপ্ত করেই ক্ষান্ত হননি, তুর্কীর ভূ-খন্ডে ইসলামের কবর রচনা করার জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন, সবই তিনি করেন। তুর্কীকে একটি সেক্যুলার রাষ্ট্র ঘোষণা করেন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজবাদের প্রচার প্রসারের পথ উন্মুক্ত করে দেন। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে দেন। মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দেন। পর্দা প্রথার বিলোপ সাধন

করেন। ইসলামী আইনের স্থলে সুইস কোড প্রবর্তন করেন। ইসলামী সংস্কৃতির বিলোপ সাধনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান।

এই সময় কেবল তুর্কীতেই নয় অন্যান্য মুসলিম দেশেও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজবাদে বিশ্বাসী বহুলোক গড়ে উঠে। এমনকি এই উপ-মহাদেশের মুসলিমদের অন্যতম প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও ইসলাম বিদ্বেষী লোক বের হতে থাকে। এই সময় 'নিগার' নামক একটি মাসিক পত্রিকা জোরে সোরে নাস্তিকতাবাদ প্রচার করতে থাকে।

মুসলিমদের এই দুর্দিনে ঘটে আরেক দুঃখজনক ঘটনা।

হিন্দুদের একটি সংগঠনের নাম ছিলো আর্যসমাজ। এই সংগঠনের অন্যতম নেতা ছিলেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। তিনি শুদ্ধি আন্দোলন নামে একটি আন্দোলন শুরু করেন ১৯২৫ সনে। তাঁর বক্তব্য ছিলো, উপ-মহাদেশের মুসলিমদের পূর্ব-পুরুষরা হিন্দু ছিলো। মুসলিম শাসকদের চাপে পড়ে তারা হিন্দুত্ব ত্যাগ করে মুসলিম হয়। এখন মুসলিমদের উচিত হিন্দুত্বে ফিরে আসা।

এই আন্দোলন ছিলো মুসলিমদের জন্য খুবই বেদনাদায়ক। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের প্রচারনায় উত্তেজিত হয়ে একজন মুসলিম ১৯২৬ সনে তাঁকে হত্যা করে। এতে গোটা উপ-মহাদেশে মুসলিম-বিরোধী দাংগা চরম আকার ধারণ করে। হিন্দু নেতারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে, আল কুরআনের বিরুদ্ধে, আল কুরআনে উল্লেখিত আল জিহাদ পরিভাষার বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে থাকেন। উদারপন্থী বলে পরিচিত মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধীও তাঁদের সাথে সুর মিলান।

৭. 'আল জমিয়ত' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

১৯২৫ সনে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ 'আলজমিয়ত' নামে একটি পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়।

১৯২৬ সনে যখন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিহত হন তখনো তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক।

এক জুমাবার মাওলানা মুহাম্মাদ আলী দিল্লীর জামে মাসজিদে ভাষণ দিচ্ছিলেন। 'আল জিহাদ' সম্পর্কে হিন্দু নেতারা যেই বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন তার জওয়াব দেয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উল্লেখ করলেন তাঁর ভাষণে।

শ্রোতাদের মধ্যে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ছিলেন। তিনি তখন ছাব্বিশ বছরের একজন যুবক। তিনি জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সদস্য ছিলেন না। কিন্তু সাংবাদিক হিসেবে তাঁর যোগ্যতার পরিচয় পেয়েই তাঁকে 'আলজমিয়ত' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলীর বক্তৃতা শুনে তিনি সংকল্প গ্রহণ করেন যে, এই বিষয়ে লিখবেন। 'আলজমিয়ত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর জ্ঞানগর্ভ লেখা 'আলজিহাদু ফিল ইসলাম'। ১৯২৬ ও ১৯২৭ সনে মোট চব্বিশটি কিস্তিতে তিনি ইসলামের 'আলজিহাদ' সংক্রান্ত ধারণা অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে তুলে ধরেন জনসমক্ষে। তাঁর লেখা অনেকের মুখে ভাষা ফুটিয়েছে। হিন্দু নেতাদের বক্তৃতা-বিবৃতির মুকাবিলা করার হাতিয়ার যুগিয়েছে অনেককে।

১৯২৮ সনে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ এক অবাক করা কান্ড করে বসে। উপ-মহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সংগঠিত করে রাজনীতিতে একটি স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টির প্রচেষ্টা না চালিয়ে জমিয়ত অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের রাজনৈতিক স্ট্যান্ডের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের এই ভূমিকা সঠিক বলে মেনে নিতে পারেন নি। ফলে তিনি 'আলজমিয়ত' পত্রিকার সম্পাদক পদে ইস্তফা দেন।

এই সময় তিনি গবেষকের মন নিয়ে ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ), ইমাম হাফিজ ইবনুল কাইয়্যিম (রহ) ও শাহ ওয়ালীউল্লাহর (রহ) গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করতে থাকেন।

৮. উপ-মহাদেশের রাজনীতিতে মুসলিম জাতীয়তাবাদী ধারা

স্যার সাইয়েদ আহমাদ খান বিশ্বাস করতেন যে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান হাছিল না করে মুসলিমরা হিন্দুদের কিংবা ইংরেজদের সমকক্ষ হতে পারবে না।

তিনি মুসলিম তরুণদেরকে যুগপৎ ইসলামী মূল্যবোধ ও ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করার অভিপ্রায় নিয়ে ১৮৭৫ সনে আলীগড় মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপন করেন।

১৮৮৫ সনে অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস গঠিত হলে স্যার সাইয়েদ আহমাদ খান মুসলিমদেরকে সযত্নে কংগ্রেসের সংশ্রব এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে কংগ্রেসের দ্বারা মুসলিমদের কোন উপকার হবে না।

স্যার সাইয়েদ আহমদ খানের এই দৃষ্টিভংগিতে অনুপ্রাণিত কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় মুসলিম ১৯০৬ সনে ঢাকাতে একত্রিত হয়ে গড়ে তোলেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ।

আগা খানের নেতৃত্বে হাঁটি হাঁটি পা পা করে মুসলিম লীগ উপ-মহাদেশের রাজনীতিতে ভূমিকা রাখতে শুরু করে। মূলত বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ও চাকুরীতে জনসংখ্যা অনুপাতে মুসলিমদের সুযোগ প্রদানের দাবিতে মুসলিম লীগ সোচ্চার ছিলো। অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগও ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে মুসলিম

জনগোষ্ঠীকে উজ্জীবিত করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। মুসলিম লীগের তাত্ত্বিক ভিত্তিকে বলা যায় মুসলিম জাতীয়তাবাদ।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস, অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস ঘেঁষা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের রাজনীতির সাথে কখনো জড়িত হননি।

৯. ইসলামী জাগরণের নাকীব 'তারজুমানুল কুরআন'

১৯৩২ সন। আবু মুহাম্মাদ মুসলিহ হায়দারাবাদ থেকে মাসিক তারজুমানুল কুরআন নামে একটি ইসলামী পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সম্পাদক হিসেবে তিনি বেছে নেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে। এই সময় তাঁর বয়স ছিলো উনত্রিশ বছর।

অল্পকাল পর এই পত্রিকার মালিকানাও তাঁর হাতে তুলে দেয়া হয়।

তারজুমানুল কুরআনের প্রথম সম্পাদকীয়তে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লিখেন, "এই পত্রিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ করা ও মানুষকে আল্লাহর পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান জানানো। বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে আল কুরআনের নিরিখে দুনিয়ায় বিস্তারশীল চিন্তা-চেতনা, সভ্যতা-সংস্কৃতির নীতিমালার ওপর মন্তব্য করা, বর্তমান দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সমাজতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে আল কুরআন ও আস্‌সুন্নাহর নীতিগুলো ব্যাখ্যা করা এবং যুগের প্রেক্ষাপটে আলকুরআন ও আস্‌সুন্নাহর বিধানগুলোর প্রয়োগ-পদ্ধতি নির্দেশ করা। এই পত্রিকা মুসলিমদেরকে এক নতুন জীবনের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে।"

ইসলামী জাগরণের নাকীব হিসেবেই মাসিক তারজুমানুল কুরআনের আত্ম-প্রকাশ ঘটে।

১০. উপ-মহাদেশের মুসলিমদের নতুন দুর্ভোগ

১৯৩৫ সনে বৃটিশ পার্লামেন্টে গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট পাস হয়। এই এ্যাক্ট অনুযায়ী প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন দেবার অভিপ্রায়ে উপ-মহাদেশকে এগারোটি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রাদেশিক পরিষদ গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়।

১৯৩৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হয় প্রাদেশিক পরিষদগুলোর নির্বাচন। নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার প্রদেশ, উড়িশা প্রদেশ, বোম্বাই প্রদেশ ও মাদ্রাজ প্রদেশ- এই সাতটি প্রদেশে কায়েম হয় কংগ্রেস সরকার। সিন্ধ প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রদেশ, বাংলা প্রদেশ ও আসাম প্রদেশ- এই চারটি প্রদেশে মুসলিম লীগ ও অন্যরা মিলে কায়েম করে কোয়ালিশন সরকার।

কংগ্রেস শাসিত সাতটি প্রদেশে কার্যত প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দুরাজ। এই প্রদেশগুলোতে জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয় বংকিম চন্দ্র চ্যাটার্জী রচিত হিন্দু রণ-সংগীত 'বন্দে মাতরম'। সরকারী ভাষা হয় হিন্দী। উর্দূ ভাষা উপেক্ষিত হয়। বিদ্যামন্দির-স্কীম ও ওয়ার্ধা স্কীম অব এডুকেশান অনুযায়ী নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়। পাঠ্যপুস্তকে স্থান পায় হিন্দু বীরদের জীবনী। মুসলিম বীরদের নামধারী স্থানগুলোর নাম পরিবর্তন করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে অনুষ্ঠিত হতে থাকে স্বরস্বতী পূজা। সরকারী চাকুরীতে মুসলিমদের রিক্রুটমেন্ট প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। মুসলিমদের ওপর হামলা চলতে থাকে নানা অজুহাতে।

১৯৩৭ সনের জুলাই মাসে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসের শাসন কায়েম হওয়ার পর আড়াই বছর ধরে এই দুর্ভোগ সইতে হয় মুসলিমদেরকে। ১৯৩৯ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে ইংরেজ শাসকগণ যুদ্ধে উপ-মহাদেশের লোকদের সহযোগিতা চায়। মোহন চাঁদ করম চাঁদ গান্ধী ইংরেজদের কাছে জানতে চান যে এই সহযোগিতা দেয়া হলে যুদ্ধের পর উপ-মহাদেশকে স্বাধীনতা দেয়া হবে কিনা। এর কোন সন্তোষজনক জওয়াব দেয়নি বৃটিশ সরকার। ফলে মিঃ গান্ধীর নির্দেশে পদত্যাগ করে সাতটি প্রদেশের কংগ্রেস সরকার। হাঁফ ছেড়ে বাঁচে সাতটি প্রদেশের কোণঠাসা মুসলিম জনগোষ্ঠী।

১৯৩৭ সনে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী দিল্লীতে আসেন ও এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে করেন। এই সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো ৩৪ বছর। দিল্লীতে অবস্থানকালে তিনি লক্ষ্য করেন যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। কংগ্রেস শাসিত সাতটি প্রদেশের মুসলিমদের করুণ দশা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করে তিনি দারুণভাবে ব্যথিত হন। হায়দারাবাদ ফিরে এসে তিনি মুসলিমদেরকে নাজুক রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে তারজুমানুল কুরআন পত্রিকায় নিবন্ধ ছাপতে থাকেন।

১১. জামালপুরের পথে

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তারজুমানুল কুরআনের সৌজন্য কপি পাঠাতেন লাহোরে ডঃ মুহাম্মাদ ইকবালের কাছে। ডঃ ইকবাল তখন বেশ বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন। অন্যকে দিয়ে পড়িয়ে তিনি তারজুমানুল কুরআন শুনতেন।

১৯৩৬ সনে ডঃ ইকবাল সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁর কর্মস্থল হিসেবে পাঞ্জাবকে বেছে নিতে। সাইয়েদ আবুল আ'লা অপরাগতা প্রকাশ করেন।

জনৈক চৌধুরী নিয়ায আলীর বিশাল ভূ-সম্পত্তি ছিলো পূর্ব পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জিলার পাঠানকোট তহসিলের জামালপুর গ্রামে। তিনি সেই সম্পত্তি দীনী কাজের জন্য ওয়াক্ফ করে দিতে চান। তিনি তারজুমানুল কুরআনের মাধ্যমে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর চিন্তাধারার সাথে পরিচিত ছিলেন। তিনি সাইয়েদ আবুল আ'লাকে তাঁর অভিপ্রায় জানিয়ে একটি চিঠি লিখেন।

আবুল আ'লা একটি ইসলামী পল্লী গড়ে তোলার পরিকল্পনা তৈরি করে পাঠান। পরিকল্পনার কপি নিয়ে চৌধুরী নিয়ায আলী ডঃ মুহাম্মাদ ইকবালের সাথে সাক্ষাত করেন। ডঃ ইকবাল এই পরিকল্পনা অনুমোদন করেন এবং এই কাজের জন্য সাইয়েদ আবুল আ'লাকে নিয়ে আসার জন্য চৌধুরী নিয়ায আলীকে পরামর্শ দেন।

চৌধুরী নিয়ায আলী সাইয়েদ আবুল আ'লাকে চিঠি লেখেন। ঐ চিঠি পেয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা লাহোরে এসে ডঃ মুহাম্মাদ ইকবালের সাথে সাক্ষাত করেন। ডঃ ইকবাল তাঁকে চৌধুরী সাহেবের আহ্বানে সাড়ে দিতে বলেন। এবার সাইয়েদ আবুল আ'লা রাজি হন।

১২. একটি লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী হায়দারাবাদ ছেড়ে যাবেন শুনে উসমানীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামীয়াত বিভাগের প্রধান মানাযির আহসান তাঁকে মাসিক আটশত পঞ্চাশ রুপি বেতনে ইসলামীয়াতের অধ্যাপক পদে নিযুক্তির প্রস্তাব দেন। সন্দেহ নেই, এটি ছিলো খুবই লোভনীয় প্রস্তাব। তাঁর বড়ো ভাই সাইয়েদ আবুল খায়েরও তাঁকে এই প্রস্তাবে সম্মত হতে বলেন। কিন্তু আল্লাহর দীনের আওয়াজ বুলন্দ করার মহান প্রেরণা তাঁকে এই লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার হিম্মত যোগায়। তিনি তাঁর বড়ো ভাইকে বলেন,

"আমি (দেশের রাজনৈতিক) দিগন্তে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখতে পাচ্ছি। সারা দেশের ওপর দিয়ে এক ভয়ানক ঝড় বয়ে যাবে। এর পরিণাম ১৮৫৭ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিণামের চেয়েও গুরুতর হবে। হায়দারাবাদে অবস্থান করে আমি এই সম্পর্কে সতর্ক সংকেত দিতে পারবো না। এখানে তা বিবেচিত হবে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে। আমাকে এমন এক জায়গায় যেতে হবে যেখান থেকে আমি স্বাধীনভাবে আমার মত প্রকাশ করতে পারবো।

কাউমের খিদমতে আমি নিজকে নিয়োজিত করতে চাই। আমি বিত্তহীন। কিন্তু আমার বিত্তহীনতা আমার সংকল্পের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। আমাকে তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছে। আমি বিলম্ব করতে পারছি না। প্রথমে অর্থ বানানোর জন্য আমি যদি দেরি করি, এই অর্থ বানানো যাত্রার বিড়ম্বনা সইতে আমাকে বাধা দেবে।

ভাই, আমাকে আমার তাকদীরের পথে অগ্রসর হবার অনুমতি দিন। আমাকে আপনার দু'আ দিন। পথ বন্ধুর। কিন্তু যদি ইচ্ছা থাকে, আল্লাহর অনুগ্রহ যদি লাভ করি, আমি আমার মিশনে সফল হবোই। আমার কাছে বৈষয়িক সুবিধা অর্জনের চেয়ে আমার মিশনের সফলতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

১৩. ইসলামী পল্লী গঠন

১৯৩৮ সনের মার্চ মাস। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর নব পরিনীতা স্ত্রী মাহমুদাহকে নিয়ে পৌঁছলেন জামালপুর।

কয়েকটি বাড়ি নিয়ে একটি গ্রাম। ঐ কয়টি বাড়ি ছাড়া আর কিছুই ছিলোনা সেখানে। শহুরে জীবনের চাকচিক্য ও সুযোগ সুবিধা এখানে অনুপস্থিত। এক মহান স্বপ্নে বিভোর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এলেন গাঁয়ে। তাঁর সাথে এলেন উচুঁ ঘরের মেয়ে মাহমুদাহ। শহর ছেড়ে অজ পাড়াগাঁয়ে এসেছেন বলে তাঁর মনে কোন দুঃখ নেই। স্বামীর মিশনে নিষ্ঠাবান সহযোগী হতে পারাতেই তাঁর আনন্দ। জামালপুরের মুক্ত পরিবেশ ও নির্মল আবহাওয়া তাঁদের বেশ ভালো লাগছিলো।

গঠিত হলো দারুল ইসলাম ট্রাস্ট। একদল গবেষক যোগাড়ের চেষ্টা করেন সাইয়েদ আবুল আ'লা। প্রথমে তাঁর ডাকে সাড়া দেন ঝিলাম জিলার খানপুর গ্রামের প্রতিভাবান যুবক ফজলুর রহমান। ইনিই পরে নায়ীম সিদ্দিকী নামে পরিচিত হন। ছয়জন সাথী নিয়ে কাজ শুরু করেন সাইয়েদ আবুল আ'লা।

মাসজিদে নিয়মিতভাবে জামায়াতে সালাত আদায় শুরু হয়। ইমামত করতেন সাইয়েদ আবুল আ'লা। প্রতিদিন সকালে অনুষ্ঠিত হতো দারসুল কুরআন।

সেখানে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী গড়ে তোলা হয়। গবেষণাধর্মী পড়াশুনা হতো সেখানে। বিকেলে তাঁরা নিকটবর্তী খালের তীরে বেড়াতে যেতেন।

জুমাবার নিকটবর্তী গ্রামের লোকেরাও আসতো ঐ মাসজিদে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী প্রাঞ্জল ভাষায় ইসলামের বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণ করে খুতবাহ দিতেন। সালাতুল জুমুআর ইমামতও তিনি করতেন। খুতবাহর মাধ্যমে তিনি ঈমান, ইসলাম, সালাত, সাউম, যাকাত, হাজ, জিহাদ ইত্যাদি সম্পর্কে শ্রোতাদেরকে জ্ঞান-সমৃদ্ধ করে তোলেন।

১৪. রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনা

হায়দারাবাদে অবস্থানকালে তিনি পত্রিকাতে প্রধানত ইসলামের মৌলিক বিষয়ে আলোচনা করতেন। জামালপুরে এসে মৌলিক বিষয়গুলোর সাথে সাথে ক্রমাগতভাবে রাজনৈতিক দিকনির্দেশনামূলক প্রবন্ধও লিখতে থাকেন।

তিনি অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের আদর্শ জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সেক্যুলার গণতন্ত্রের সমালোচনা করেন। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ কংগ্রেসের রাজনীতির সমর্থকে পরিণত হওয়ায় তিনি এই সংস্থারও সমালোচনা করেন। তদুপরি মুসলিম লীগের ভ্রান্তিও তিনি চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে থাকেন।

অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রধান চালিকা শক্তি ছিলেন জাওহার লাল নেহরু। তিনি মুসলিমদেরকে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে মেনে নিতে ছিলেন নারাজ। তাঁর মতে মুসলিমদেরকে আলাদা জাতি গণ্য করার অর্থ দাঁড়াবে একজাতির ভেতর আরেক জাতির অস্তিত্ব মেনে নেয়া। তদুপরি তিনি ছিলেন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। তিনি ধর্ম-কর্মকে কুসংস্কার গণ্য করতেন। তিনি ব্যঙ্গ করে বলতেন যে ইসলামী জীবন পদ্ধতি মানে হচ্ছে বিশেষ ধরনের পাজামা পরা, দাড়ি রাখা ও বিশেষ ধরনের লোটা (বদনা) বহন করা।

জাওহার লাল নেহরু জানতেন যে মুসলিমরা তেমন সংগঠিত নয়। 'মুসলিম গণ সংযোগ' কার্যক্রম পরিচালনা করে তাদেরকে কংগ্রেসের ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়া সম্ভব। সেই জন্য কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত মুসলিম নামধারী ব্যক্তিদের দ্বারাই এই কার্যক্রম শুরু হয়।

বিহার প্রদেশের ডঃ সাঈদ মাহমুদ নামকাওয়াস্তে মুসলিম ছিলেন। কার্যত তিনি ছিলেন ইসলামের কট্টর দুশমন। তিনি বলতেন যে ধর্মীয় পরিচয়ে হিন্দু ও মুসলিমরা পরিচিত হওয়া উচিত নয়। দেশের নাম 'হিন্দুস্থান' আর দেশের সবাই 'হিন্দী' বলে আখ্যায়িত হওয়া উচিত। মুসলিমদেরও উচিত হিন্দী নাম গ্রহণ করা। এতে হিন্দু-মুসলিমের পার্থক্য ঘুচে যাবে।

অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস মুসলিমদেরকে বোকা বানিয়ে দলে ভেড়াবার জন্য "ইসলামীয়াত সেল" গঠন করে। এর প্রধান কর্মকর্তা হন ডঃ মুহাম্মাদ আশরাফ। তিনি প্রচার করতেন যে রাজনীতিতে ধর্মকে টেনে আনা পশ্চাদপদতার লক্ষণ। একটি প্রগতিশীল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক বিষয়ে একজন হিন্দু হিন্দু থাকবে না, একজন মুসলিম মুসলিম থাকবে না। ব্যক্তিগত জীবনে তারা যেই কোন ধর্মে বিশ্বাস রাখতে পারে, কিন্তু প্রকাশ্য জীবনে ধর্মমত নির্বিশেষে একজাতির সদস্য হিসেবে আচরণ করবে। ডঃ মুহাম্মাদ আশরাফ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মুসলিমদেরকে বলতে থাকেন যে দুনিয়ার পরবর্তী দ্বন্দ্ব হবে বিত্তবানদের সাথে সর্বহারাদের। আর মুসলিমরা যেহেতু অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে রয়েছে, একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাঝেই নিহিত রয়েছে তাদের মুক্তি।

এই সব বক্তব্যে বিভ্রান্ত হচ্ছিলো মুসলিম জনগোষ্ঠী। তখন সামগ্রিকভাবে উপ-মহাদেশের মুসলিমদের আদর্শিক অবস্থা ছিলো খুবই নাজুক। ইসলাম ও জাহিলিয়াহর পার্থক্য বুঝার যোগ্যতা ছিলো না তাদের অনেকের। ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধান সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতা তাদেরকে সহজেই বিপথগামী করে তুলছিলো।

এই অমানিশায় ইসলামের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করে লিখে চলছিলেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। আদর্শিক জ্ঞান বিতরণের সাথে সাথে রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনামূলক লেখাও তিনি লিখছিলেন।

সামগ্রিকভাবে মুসলিমরা কংগ্রেসে যোগদানের ব্যাপারে ছিলো দ্বিধান্বিত। সেই জন্য কংগ্রেস মুসলিমদেরকে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি বলে আখ্যায়িত করতে থাকে। এই সময় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লিখেন যে মুসলিমরা স্বাধীনতার বিরোধী নয়। কিন্তু তারা এমন স্বাধীনতা চায় যেখানে তারা মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করার ও ইসলামী নীতির ভিত্তিতে সংগঠিত রাষ্ট্র হিসেবে তাদের সমাজ পরিচালনার নিশ্চয়তা লাভ করবে।

১৫. 'এক জাতি' তত্ত্বের পক্ষে মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানীর ওকালতি

১৯৩৮ সনের প্রথম ভাগেই জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের অন্যতম শীর্ষ নেতা মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী 'মুত্তাহিদা কাওমিয়াত' শীর্ষক বই লিখে মুসলমানদেরকে বুঝাতে চান যে হিন্দু-মুসলিম মিলে এক জাতি হওয়াতে ও একত্রে কাজ করাতে কোন দোষ নেই।

মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী তাঁর বইতে লিখেন,

"আমরা প্রতিদিন সম্মিলিত স্বার্থের জন্য সংঘ বা সমিতি গঠন করে থাকি এবং তাতে শুধু অংশ গ্রহণ করি না বরং সদস্যপদ লাভ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টাও করে থাকি। শহর এলাকা, বিশেষ এলাকা, মিউনিসিপ্যাল বোর্ড, জিলাবোর্ড, ব্যবস্থা পরিষদ, শিক্ষা সমিতি ও এই ধরনের শত শত সমিতি রয়েছে যা বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুযায়ী গঠিত। এইসব সমিতিতে অংশগ্রহণ করা এবং সেই জন্য পূর্ণভাবে কিংবা আংশিকভাবে চেষ্টা করাকে কেউ নিষিদ্ধ বলে না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, এই ধরনের কোন সমিতি যদি দেশের স্বাধীনতা অর্জন ও বৃটিশ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাতে অংশ গ্রহণ করা হারাম, ন্যায়পরায়ণতার খেলাফ, ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থি ও জ্ঞান-বুদ্ধির বিপরীত হয়ে যায়।" মুত্তাহিদা কাউমিয়াত, হুসাইন আহমাদ মাদানী, পৃঃ ৫২

১৬. 'এক জাতি' তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ

জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে মুসলিমরা যাতে চিন্তার বিভ্রান্তির শিকার না হয় সেই জন্য সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তারজুমানুল কুরআনে এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা পেশ করেন "মাসালায়ে কাউমিয়াত" নামে। তিনি লিখেন, "ইসলামী জাতীয়তায় মানুষে মানুষে পার্থক্য করা হয় বটে, কিন্তু জড়, বৈষয়িক ও বাহ্যিক কোন কারণে নয়। এটা করা হয় আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিকতার দিক দিয়ে। মানুষের সামনে এক স্বাভাবিক সত্য-বিধান পেশ করা হয়েছে, যার নাম ইসলাম। আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য, হৃদয়-মনের পবিত্রতা-বিশুদ্ধতা, কর্মের অনাবিলতা, সততা ও দীন অনুসরণের দিকে গোটা মানব জাতিকে আহ্বান জানানো হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, যারা এই আহ্বান গ্রহণ করবে তারা একজাতি হিসেবে গণ্য হবে। আর যারা তা অগ্রাহ্য করবে তারা ভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ মানুষের একটি হচ্ছে ঈমান ও ইসলামের জাতি। তার ব্যক্তি সমষ্টি মিলে একটি উম্মাহ। মানুষের অন্যটি হচ্ছে কুফর ও ভ্রষ্টতার জাতি। তারা পারস্পরিক মত-বিরোধ ও বৈষম্য সত্ত্বেও একই দল।"

"এই দুইটি জাতির মধ্যে বংশ ও গোত্রের দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য বিশ্বাস ও কর্মের। কাজেই একই আব্বা-আম্মার দুই সন্তান ইসলাম ও কুফরের উল্লেখিত পার্থক্যের কারণে স্বতন্ত্র দুই জাতির মধ্যে গণ্য হতে পারে এবং দুই নিঃসম্পর্ক ও অপরিচিত ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করার কারণে এক জাতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে।"

"জন্মভূমির পার্থক্যও এই উভয় জাতির ব্যবধানের কারণ হতে পারে না। এখানে পার্থক্য করা হয় হক ও বাতিলের ভিত্তিতে। আর হক ও বাতিলের স্বদেশ বা জন্মভূমি বলে কিছু নেই। একই শহর একই মহল্লা ও একই ঘরের দুই ব্যক্তির জাতীয়তা ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন হতে পারে। একজন নিগ্রো ইসলামের সূত্রে একজন মরক্কোবাসীর ভাই হতে পারে।"

"বর্ণের পার্থক্যও এখানে জাতীয় পার্থক্যের কারণ নয়। বাহ্যিক চেহারার রঙ ইসলামে নগন্য। এখানে একমাত্র আল্লাহর রঙেরই গুরুত্ব রয়েছে। আর এটাই হচ্ছে সবচে' উত্তম রঙ।"

"ভাষার বৈষম্যও ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যের কারণ নয়। ইসলামে মুখের ভাষার মূল্য নেই, মূল্য হচ্ছে হৃদয়ের ভাষাহীন কথার।"

"ইসলামী জাতীয়তা বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর

রাসূলুল্লাহ"। বন্ধুতা আর শত্রুতা এই কালেমার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। এই স্বীকৃতি মানুষকে একীভূত করে, অস্বীকৃতি চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটায়। এই কালেমা যাকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে রক্ত, মাটি, ভাষা, বর্ণ, শাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি কোন সূত্র ও কোন আত্মীয়তাই যুক্ত করতে পারে না। অনুরূপভাবে এই কালেমা যাদেরকে যুক্ত করে তাদেরকে কোন কিছুই বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।"

"উল্লেখ্য যে অমুসলিম জাতিগুলোর সাথে মুসলিম জাতির সম্পর্কের দুইটি দিক রয়েছে। প্রথমটি এই যে, মানুষ হিসেবে মুসলিম অ-মুসলিম সকলেই সমান। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই যে, ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যের কারণে আমাদেরকে তাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়া হয়েছে। প্রথম সম্পর্কের দিক দিয়ে মুসলিমরা তাদের সাথে সহানুভূতি, ঔদার্য ও সৌজন্যমূলক আচরণ করবে। কারণ মানবতার নিরিখে এই রূপ ব্যবহারই তারা পেতে পারে। এমন কি তারা যদি ইসলামের দুশমন না হয়, তাদের সাথে বন্ধুত্ব, সন্ধি ও মিলিত উদ্দেশ্যের (Common Cause) জন্য সহযোগিতাও করা যেতে পারে। কিন্তু কোন প্রকার বস্তুগত ও বৈষয়িক সম্পর্ক তাদেরকে ও আমাদেরকে মিলিত করে 'এক জাতি' বানিয়ে দিতে পারে না।"

১৭. লাহোরে আগমন

দূরদর্শী সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী অনুভব করেন যে সামগ্রিক প্রয়োজনের বিবেচনায় দারুল ইসলাম ট্রাস্টকে দারুল ইসলাম আন্দোলনে পরিণত করা প্রয়োজন। এই বিষয়ে চৌধুরী নিয়ায আলীর সাথে তাঁর মত পার্থক্য সৃষ্টি হয়। চৌধুরী নিয়ায আলীর মত ছিলো, দারুল ইসলাম ট্রাস্ট চিন্তা-গবেষণার কাজ চালাতে থাকুক, আর রাজনীতি সামলাক মুসলিম লীগ। এই মত পার্থক্যের কারণে সাইয়েদ আবুল আ'লা জামালপুর ত্যাগ করেন।

১৯৩৮ সনের ডিসেম্বর মাসে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লাহোর আসেন। ইসলামীয়া পার্কের একটি বাড়ি ভাড়া করে তিনি তাতে উঠেন। এই বাড়িটি তাঁর বাসস্থান ও তারজুমানুল কুরআনের কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

১৮. আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি

১৯৩৯ সনে শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ঐ বছর পহেলা সেপ্টেম্বর বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার ঘোষণা দেন। তিনি দুনিয়াবাসীকে এই ধারণা দেবার চেষ্টা করেন যে ইংরেজ জাতি শান্তি-প্রিয় জাতি, তাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে এবং শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার খাতিরে ইংরেজরা যুদ্ধে নামতে বাধ্য হচ্ছে।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তারজুমানুল কুরআনে নিবন্ধ লিখে ইংরেজ জাতির ভালো মানুষীর মুখোশ খুলে দেন। তিনি লিখেন যে দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে ইংরেজরাই সবচে' বেশি শক্তিশালী, তারা দুনিয়ার বহু দেশে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চালিয়ে সেইগুলোকে তাদের পদানত করেছে, উপমহাদেশেও তারা প্রতারণা ও চাতুর্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তারা মুসলিমদেরকে যেই সব ওয়াদা দিয়েছিলো সেইগুলো রক্ষা করেনি, তারাই মুসলিমদের মধ্যে অনৈক্যের বীজ বুনেছে, মুসলিমদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়েছে এবং তারাই মুসলিম ফিলিস্তিনের বুকে ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছে। এই সব রেকর্ড নিয়ে তারা শান্তির জন্য যুদ্ধে নেমেছে এমন দাবি করা শোভা পায় না।

১৯. লাহোর ইসলামীয়া কলেজে অধ্যাপনা

১৯৩৯ সনের ৭ই সেপ্টেম্বর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লাহোর ইসলামীয়া কলেজে ইসলামীয়াতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তবে তিনি বেতন নিতে রাজি হননি। অধ্যাপক হিসেবে তিনি ইসলামের আধ্যাত্মিক দিক বিশ্লেষণ করেই ক্ষান্ত হতেন না। তিনি সুন্দরভাবে ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি, মুসলিম উম্মাহর কর্তব্য ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপন করতেন। এতে কলেজ কর্তৃপক্ষ বিব্রত বোধ করে ও তাঁকে রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা পরিহার করতে বলে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী কর্তৃপক্ষের বেঁধে দেয়া গন্ডির ভেতরে থেকে ইসলামকে কাটসাঁট করে আলোচনা রাখতে অস্বীকৃতি জানান।

এই মতপার্থক্যের কারণে ১৯৪০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ইসলামীয়া কলেজে অধ্যাপনা ত্যাগ করেন।

অখন্ড মনোযোগ সহকারে তিনি তারজুমানুল কুরআন সম্পাদনা করতে থাকেন।

২০. পাকিস্তান আন্দোলন

মিঃ মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ প্রথমে অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। পরে তিনি একই সময়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সদস্য রূপে কাজ করেন। পরে কংগ্রেসের মুসলিম-বিদ্বেষী মনোভংগির কারণে তিনি কংগ্রেস থেকে সরে আসেন। ১৯৩৪ সনে তিনি অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। তখন থেকে মুসলিম লীগ বেগবান হয়ে উঠে।

১৯৪০ সনের ২২, ২৩ ও ২৪শে মার্চ লাহোরের মিন্টু পার্কে অনুষ্ঠিত হয় অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলন। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করতে গিয়ে মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ বলেন,

"এই কথা বুঝা বড়ো কঠিন যে আমাদের হিন্দু ভাইয়েরা ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ কেন বুঝতে পারেন না। আসলে এই দুইটি কোন ধর্ম নয় বরং প্রকৃত পক্ষে দুইটি পৃথক ও সুস্পষ্ট সমাজ ব্যবস্থা এবং হিন্দু ও মুসলিমকে মিলিত করে একই জাতীয়তা গঠন একটা কল্পনা বিলাস মাত্র। এক জাতীয়তাবাদের ভুল ধারণাটি সীমালংঘন করে আমাদের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ হয়ে পড়েছে। যথাসময়ে আমাদের দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হলে, ভারতকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হবে। হিন্দু ও মুসলিমদের পৃথক পৃথক ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক রীতিনীতি ও সাহিত্য-সম্ভার রয়েছে। তারা পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় না, একত্রে পানাহার করে না। তারা দুইটি স্বতন্ত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারী যা দুইটি বিপরীত ধারণা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে গঠিত। তাদের জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভংগিও আলাদা।

এই কথাও সত্য যে হিন্দু ও মুসলিম ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে প্রেরণা লাভ করে। তাদের রয়েছে পৃথক মহাকাব্য, মহাগ্রন্থ, পৃথক জাতীয় বীর এবং প্রাসংগিক উপাদান ও ঘটনাপঞ্জী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজনের জাতীয় বীর অন্য জনের শত্রু। এই ধরনের বিপরীতমুখী দুইটি জাতিকে– যাদের একটি সংখ্যাগুরু ও অপরটি সংখ্যালঘু– একই রাষ্ট্রে যুক্ত করে দিলে অশান্তি বাড়তে থাকবে এবং এমন রাষ্ট্রে সরকার পরিচালনার জন্য যেই কাঠামোই তৈরি হবে তা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যাবে। জাতির যেই কোন সংজ্ঞা অনুযায়ী মুসলিমরা একটি জাতি এবং অবশ্যই তাদের থাকতে হবে একটি আবাসভূমি, একটি ভূখন্ড বা অঞ্চল ও একটি রাষ্ট্র।"

দ্রষ্টব্য ঃ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, আব্বাস আলী খান, পৃষ্ঠা ৪২২ ও ৪২৩

পরদিন অর্থাৎ ২৩শে মার্চ উপ-মহাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ও পূর্ব অঞ্চলকে নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব পাঠ করেন শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক। সম্মেলন সর্ব সম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করে। এই প্রস্তাবই "লাহোর প্রস্তাব" ও "পাকিস্তান প্রস্তাব" নামে সুবিদিত।

তখন থেকে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান নামে মুসলিমদের একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলতে থাকে। এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান শ্লোগান ছিলো– "পাকিস্তান কা মাতলাব কেয়া? –লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" মুসলিম জনগোষ্ঠীকে এই ধারণাই দেয়া হচ্ছিলো যে পাকিস্তান হবে একটি ইসলামী রাষ্ট্র। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য উপকরণ ইসলামী ব্যক্তিত্ব গঠনের কোন উদ্যোগই নিচ্ছিলেন না মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ।

এই বিষয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু তাঁরা তাঁর কথায় কান দিলেন না।

২১. ইসলামী রাষ্ট্র গঠন পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ

১৯৪০ সনের ১২ সেপ্টেম্বর "আনজুমানে ইসলামী তারীখ ওয়া তামাদ্দুন" নামক সংস্থার উদ্যোগে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্র্যাচি হলে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী একটি জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন। বিষয়বস্তু ছিলো "ইসলামী হুকুমাত কিস তারাহ্ কায়েম হোতি হায়।"

(ইসলামী রাষ্ট্র কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়)।

সেই ভাষণের একাংশে তিনি বলেন,

"এই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজন এমন সব লোকের যাদের অন্তরে রয়েছে আল্লাহর ভয়। যারা নিজেদের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহি করতে হবে বলে অনুভূতি রাখে। যারা দুনিয়ার ওপর আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেয়। যাদের দৃষ্টিতে নৈতিক লাভ-ক্ষতি পার্থিব লাভ-ক্ষতির চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যারা সর্বাবস্থায় সেই সব আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে যা তাদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি হয়েছে। যাদের চেষ্টা-সাধনার একমাত্র লক্ষ্য হবে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন। ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বার্থের দাসত্ব ও কামনা-বাসনার গোলামীর জিঞ্জির থেকে যাদের গর্দান সম্পূর্ণ মুক্ত। হিংসা-বিদ্বেষ ও দৃষ্টির সংকীর্ণতা থেকে যাদের মন-মানসিকতা সম্পূর্ণ পবিত্র। ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার নেশায় যারা উন্মাদ হবার নয়। ধন-সম্পদের লালসা আর ক্ষমতার লিপ্সায় যারা কাতর নয়। এই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এমন নৈতিক বলিষ্ঠতার অধিকারী একদল লোক প্রয়োজন পৃথিবীর ধনভান্ডার হাতে এলেও যারা নিখাদ আমানতদার প্রমাণিত হবে। ক্ষমতা হস্তগত হলে জনগণের কল্যাণ চিন্তায় যারা না ঘুমিয়ে রাত কাটাবে। আর জনগণ যাদের সুতীব্র দায়িত্বানুভূতিপূর্ণ তত্ত্বাবধানে নিজেদের জান-মাল-ইযযতসহ যাবতীয় বিষয়ে থাকবে নিরাপদ ও নিরুদ্বিগ্ন। ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজন এমন একদল লোকের যারা কোন দেশে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করলে সেখানকার লোকেরা গণহত্যা, জনপদ ধ্বংসসাধন, যুলম-নির্যাতন, গুন্ডামী বদমায়েসী ও ব্যভিচারের ভয়ে ভীত হবে না। বরং বিজিত দেশের মানুষেরা এদের প্রতিটি সিপাহীকে পাবে তাদের জান-মাল-ইযযতের ও নারীদের সতীত্বের হিফাজতকারী রূপে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তারা এতোটা সুখ্যাতি ও মর্যাদার অধিকারী হবে যে তাদের সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, নৈতিক-চারিত্রিক

উৎকর্ষ ও ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পালনে গোটা দুনিয়া তাদের প্রতি হবে আস্থাশীল। এই ধরনের এবং কেবলমাত্র এই ধরনের লোকদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ইসলামী রাষ্ট্র।"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী বিপ্লবের পথ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-১৮

তিনি আরো বলেন,

"বর্তমানে মুসলিম নামে যেই জাতিটি এই দেশে বাস করছে তাতে ভালো-মন্দ সকল প্রকার লোকই রয়েছে। চরিত্রের দিক থেকে কাফিরদের মধ্যে যতো প্রকার লোক পাওয়া যায় ততো প্রকার লোক এই জাতির মধ্যেও বর্তমান। কোন কাফির জাতি আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার জন্য যতো লোক যোগাড় করতে পারবে সম্ভবত এই জাতিও ততো লোক একত্রিত করতে পারবে। সুদ, ঘুষ, চুরি, ডাকাতি, যিনা, মিথ্যাচার ও ধোঁকাবাজিসহ যাবতীয় নৈতিক অপরাধের কাজে এই জাতিটি কাফিরদের চেয়ে মোটেই কম পারদর্শী নয়। পেট ভর্তি ও অর্থ উপার্জনের জন্য কাফিররা যতো পথ অবলম্বন করে এই জাতির লোকেরাও ঠিক ততো পথই অবলম্বন করে। নিজ মুয়াক্কেলকে জিতানোর জন্য একজন মুসলিম আইনজীবী প্রকৃত সত্যকে চাপা দেবার সময় ঠিক ততোটাই আল্লাহর ভয়হীন হয়ে থাকে যতোটা হয়ে থাকে একজন অ-মুসলিম আইনজীবী। একজন মুসলিম ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দ্বারা ও একজন মুসলিম শাসক ক্ষমতার দাপটে ঠিক সেই সব কাজই করে যা করে অ-মুসলিম ধনী ব্যক্তি ও শাসকেরা। যেই জাতি নৈতিক দিক দিয়ে এতোটা অধঃপতিত, তার সকল জগাখিচুড়ি চরিত্রের লোকদেরকে সংগঠিত করে দিলে, কিংবা রাজনৈতিক ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে তাদেরকে শৃগালের চাতুর্য শিখিয়ে দিলে অথবা সামরিক ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকে হিংস্র করে তুললে জংগলের কর্তৃত্ব লাভ হয়তো সহজ হবে, কিন্তু আমি বুঝি না তাদের দ্বারা আল্লাহর কালেমাকে বিজয়ী করার কাজ কিভাবে হওয়া সম্ভব।"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী বিপ্লবের পথ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা ২৩

আরো এগিয়ে তিনি বলেন,

"এছাড়া আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন এমন নেতৃত্ব যারা সেই সব নীতি থেকে এক ইঞ্চিও বিচ্যুত হবে না যেইগুলোর প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের আবির্ভাব। এই আদর্শিক দৃঢ়তার ফলে সকল মুসলিমকে যদি না খেয়েও মরতে হয় এমন কি তাদেরকে যদি হত্যাও করা হয়, তবুও তাদের নেতৃবৃন্দ বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি বরদাশত করতে প্রস্তুত হবে না। যেই নেতৃত্ব কেবল জাতির স্বার্থ

দেখে, আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে জাতির স্বার্থে যেই কোন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর ভয়শূন্য, তারা যে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার মহান কাজের একেবারেই অযোগ্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী বিপ্লবের পথ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা- ২৪

"গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতা তো সেইসব লোকের হাতেই আসবে যাদেরকে ভোটাররা সমর্থন করবে। ভোটারদের মধ্যে যদি ইসলামী চিন্তা ও মানসিকতা সৃষ্টি না হয়, খাঁটি ইসলামী নৈতিক চরিত্র গঠনের আগ্রহই যদি তাদের না থাকে এবং ইসলামের সেই নিরপেক্ষ ইনসাফ ও অলংঘনীয় নীতিগুলো যদি তারা মেনে চলতে প্রস্তুত না হয় যেইগুলোর ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে, তবে তাদের ভোট দ্বারা কখনো খাঁটি মুসলিম নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে আসতে পারবে না। এই অবস্থায় কেবল ঐসব লোকই নেতৃত্ব হাসিল করবে যারা আদমশুমারী অনুযায়ী তো মুসলিম, কিন্তু দৃষ্টিভংগি, কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতির দিক থেকে তাদের গায়ে ইসলামের বাতাসও লাগেনি। স্বাধীন মুসলিম দেশে এই ধরনের লোকদের হাতে নেতৃত্ব আসার অর্থ হচ্ছে আমরা ঠিক সেই জায়গাতেই অবস্থান করবো, যেখানে অবস্থান করছিলো অ-মুসলিম সরকার। বরং এই ধরনের মুসলিম সরকার আমাদেরকে তার চাইতেও নিকৃষ্ট অবস্থায় নিয়ে যাবে।"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী বিপ্লবের পথ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা, ২৬, ২৭

সেই ভাষণের একাংশে তিনি বলেন,

"অলৌকিকভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে না। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য এমন একটি আন্দোলন উত্থিত হওয়া অপরিহার্য যার বুনিয়াদ নির্মিত হবে সেই জীবন দর্শন, সেই জীবনোদ্দেশ্য, সেই নৈতিক মানদন্ড ও সেই চারিত্রিক আদর্শের ওপর যা হবে ইসলামের প্রাণশক্তির সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যশীল। কেবল সেই সব লোকই এই আন্দোলনের নেতা ও কর্মী হবার যোগ্য যারা এই বিশেষ ছাঁচে ঢেলে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে প্রস্তুত হবেন এবং সেই সাথে সমাজে অনুরূপ মন-মানসিকতা ও নৈতিক প্রাণশক্তির প্রসারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন।"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী বিপ্লবের পথ, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা-১৯

২২. জাহিলিয়াহর স্বরূপ উদ্ঘাটন

১৯৪১ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারী পেশাওয়ার ইসলামীয়া কলেজের "মাজলিস-ই-ইসলামীয়াত" কর্তৃক আয়োজিত একটি আলোচনা সভায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন।

এই ভাষণে তিনি জাহিলিয়াহর বিভিন্নরূপ অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেন। জাহিলিয়াহ ব্যক্তি মানুষ ও সমাজকে কিভাবে বিনষ্ট করে তা তিনি তুলে ধরেন তাঁর আলোচনায়। এরি পাশাপাশি ইসলামের জীবনদর্শন ও তার কল্যাণময়তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে তিনি উপস্থাপন করেন। নিম্নে আমরা তাঁর ভাষণের সারকথাগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

নাস্তিকতাবাদ

জাহিলিয়াহর একটি রূপ হচ্ছে নাস্তিকতাবাদ। এই মতবাদ এই ধারণা ব্যক্ত করে যে বিশ্বজাহান আপনা-আপনি তৈরি হয়েছে, আপনা-আপনি শেষ হবে যাবে। এর কোন মালিক নেই। থাকলেও মানব জীবনের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। মানুষও এক প্রকার জন্তু। অন্যসব কিছুর মতো পৃথিবীতে ঘটনাক্রমে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। মানুষ এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকে ও বিচরণ করে। তার মাঝে নানা ধরনের কামনা, বাসনা ও লালসা রয়েছে। এইগুলো চরিতার্থ করার জন্য তার মাঝে নিহিত শক্তিগুলো তাকে উত্তেজনা দেয়। তার রয়েছে অংগ-প্রত্যংগ, বিভিন্ন অস্ত্র ও সরঞ্জাম। এইগুলোর সাহায্যে সে তার কামনা-বাসনা-লালসা চরিতার্থ করতে পারে। পৃথিবীর বিস্তৃত অংগনে সে বহুবিধ উপকরণ-উপাদান দেখতে পায়। তার অংগ-প্রত্যংগ দ্বারা এইগুলো ব্যবহার করে সে তার আকাংখা পূরণ করতে পারে। চারদিকে ছড়িয়ে থাকা অফুরন্ত সামগ্রী সে ভোগ-ব্যবহার করবে– পৃথিবীতে এটাই তার কাজ। এমন কোন শক্তিধর ও কর্তৃত্বশীল সত্তা নেই যার কাছে মানুষ জওয়াবদিহি করতে বাধ্য। মানুষ স্বাধীন। কারো কাছে তার দায়বদ্ধতা নেই। পথ-নির্দেশ লাভের কোন উৎস কোথাও নেই। নিজের জন্য প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করা, নিজের শক্তিগুলোর ব্যবহার ক্ষেত্র বাছাই করা, পৃথিবীর জীবকুল ও বস্তু-সম্ভারের সাথে তার সম্পর্ক ও কর্মনীতি নির্ধারণ করা তারই কাজ। এই সব বিষয়ে কোন পথ নির্দেশ পেতে হলে জন্তু-জানোয়ারের জীবনে, পাথর ও পাহাড়ের ইতিকথায় ও মানুষের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ওপরই নির্ভর করতে হবে। নিজেদের মধ্য থেকে উদ্ভূত ও সমাজে মানুষের ওপর প্রভাবশীল রাষ্ট্র-শক্তির কাছে তাকে জওয়াবদিহি করতে হবে, অন্য আর কারো কাছে নয়। পৃথিবীর জীবনই মানুষের একমাত্র জীবন। তার কাজের ফলাফল এই জীবনেই সীমাবদ্ধ। এই জীবনে প্রকাশিত ফলের ভিত্তিতে নির্ণয় করতে হবে কোন নীতি শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ, ভুল কিংবা নির্ভুল, উপকারী কিংবা অনুপকারী, গ্রহণযোগ্য কিংবা বর্জনযোগ্য।

এই মতবাদ অনুসরণের ফলে মানুষ স্বেচ্ছাচারী ও দায়িত্বহীন কর্মপন্থা গ্রহণ করে।

সে নিজকে নিজের দেহ ও দৈহিক শক্তিগুলোর মালিক মনে করে। নিজের ইচ্ছা মতোই এইগুলো ব্যবহার করে। পৃথিবীর যেই বস্তু তার করায়ত্ত হয় কিংবা যেই ব্যক্তির ওপর কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় সে ঐ বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি মালিকের আচরণই প্রদর্শন করে। প্রাকৃতিক আইন ও সমাজবদ্ধ জীবন ধারার দাবি ছাড়া আর কোন শক্তিই তার স্বাধীন অধিকার ও ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করতে পারে না। তার মনে কোন নৈতিক অনুভূতি থাকে না যা তার বল্গাহীন জীবন ধারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ফলে সে অত্যাচারী, বিশ্বাসঘাতক, দুর্নীতিপরায়ণ, দুষ্কর্মশীল ও ধ্বংসসাধনকারী হয়ে থাকে। সে স্বার্থপর ও সুবিধাবাদী হয়ে থাকে। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা পূর্ণ করা ছাড়া তার জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য থাকে না। যেই সব জিনিস তার জীবনের এই উদ্দেশ্য পূরণের সহায়ক, তার দৃষ্টিতে তা-ই মূল্যবান ও গ্রহণযোগ্য।

'এই মনোভংগি সম্পন্ন লোকদের সমন্বয়ে গঠিত সমাজের রাজনীতি মানব-প্রভুত্বের ওপর স্থাপিত হয়। তা এক ব্যক্তি, এক পরিবার, বিশেষ শ্রেণী কিংবা জনগণের প্রভুত্বও হতে পারে। সকল অবস্থাতেই আইন-প্রণেতা হয় মানুষ। সবচে' বেশি ধূর্ত, শঠ, কপট, প্রতারক, মিথ্যাবাদী, শক্তিশালী ও পাপিষ্ঠ লোকই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও আধিপত্য লাভ করতে পারে। তাদের বিধান-গ্রন্থে শক্তির নামই সত্য। আর দুর্বলতা গণ্য হয় বাতিল বলে। এই সমাজে শিল্প-সাহিত্যে নগ্নতা ও পশুত্বের ভাবধারা ক্রমশ প্রবল হতে থাকে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কখনো সামন্তবাদ কখনো পুঁজিবাদ আবার কখনো সর্বহারাদের একনায়কত্ব কায়েম হয়। এই সমাজে সুবিচারপূর্ণ অর্থ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা আদৌ সম্ভব নয়। এই সমাজের প্রতিটি মানুষই তো মনে করে যে, পৃথিবী একটি লুণ্ঠন ক্ষেত্র। কাজেই যে যেইভাবে পারে সম্পদ কুক্ষিগত করে। এই সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থাও এই বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগির ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখাকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যাতে মানুষের মন-মগজে উপরোল্লেখিত চিন্তাধারা বদ্ধমূল হয়ে যায়।

অংশীবাদ

জাহিলিয়াহর আরেকটি রূপ হচ্ছে অংশীবাদ বা শিরক। এই মতবাদ এই ধারণা ব্যক্ত করে যে বিশ্ব-জাহান বহু সংখ্যক দেব-দেবী দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্ব-জাহানের বিভিন্ন শক্তি বিভিন্ন দেব-দেবীর হাতে নিবদ্ধ। কোন কোন মুশরিক জাতি তাদের উপাস্যদেরকে এমনভাবে সাজিয়ে নেয় যে, একজন প্রধান দেবতা আছে, আর এই প্রধান দেবতা বহু অ-প্রধান দেবতা দ্বারা পরিবেষ্টিত। অ-প্রধান

দেবতাদেরকে সন্তুষ্ট করেই প্রধান দেবতাকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব। এই মতবাদের অনুসারীরা বিশিষ্ট জীবিত ব্যক্তি, বিশিষ্ট মৃত ব্যক্তি, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, আগুন, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতিকে উপাস্য বানিয়ে নেয়। যুগে যুগে আবির্ভূত নবী-রাসূলদের শিক্ষার প্রভাবে মানুষ এক আল্লাহর স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু কালক্রমে মানুষ ঐ নেক বান্দাদের প্রতি এমন আচরণ শুরু করে যার ফলে তাঁরা মুশরিক ব্যক্তিদের অ-প্রধান দেবতার মর্যাদা পেতে থাকেন।

এই মতবাদের অনুসারী মানুষের জীবন অবাস্তব আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। তারা বহু কিছুকে অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন মনে করে ও মানুষের ভাগ্যের ওপর ভালো কিংবা মন্দ প্রভাব ফেলতে সক্ষম মনে করে। মুশরিকী কু-সংস্কারে আচ্ছন্ন ব্যক্তিদেরকে ধূর্ত কিছু লোক প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে অর্থ লুণ্ঠনের ব্যবস্থা করে। কেউ নিজেই রাজা-বাদশাহ হয়ে বসে, কেউ বা সূর্য, চন্দ্র বা কোন কল্পিত দেবতার সাথে বংশ-সম্পর্ক দেখিয়ে লোকদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করে যে এরাও দেবতা, আর লোকেরা তাদের দাস। কেউ বা পুরোহিত সেজে বসে ও দাবি করে যে যাদের হাতে উপকার-অপকারের চাবিকাঠি তাদের সাথে এদের নিকট-সম্পর্ক বিদ্যমান। এইসব কাল্পনিক দেবতাদের কাছ থেকে মানুষ অনুসরণযোগ্য কোন জীবন ব্যবস্থা লাভ করতে পারে না। মানুষ এই কাল্পনিক দেবতাদের অনুগ্রহ ও সাহায্য লাভের আশায় তাদের পূজা-অর্চনায় নিয়োজিত থাকে। কিন্তু জীবনের বৃহৎ ও বিশাল অংগনে বাস্তব কাজকর্মের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইন-কানুন তৈরি করা মানুষের নিজেদেরই হাতে থাকে। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প-সাহিত্য, শিক্ষা-নীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই মতবাদের অনুসারীদের আচরণ নাস্তিকতাবাদের অনুসারীদের আচরণের অনুরূপই হয়ে থাকে।

সর্বেশ্বরবাদ

জাহিলিয়াহর আরো একটি রূপ হচ্ছে সর্বেশ্বরবাদ। এই মতবাদ এই ধারণা ব্যক্ত করে যে মানুষ ও বিশ্ব-জাহানের সব কিছুই অ-প্রকৃত। এইগুলোর আদৌ কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। একই সত্তা এই বিশ্ব-জাহানকে আত্মপ্রকাশের মাধ্যম বানিয়েছে এবং সেই সত্তাই সব কিছুতেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশমান।

এই মতবাদের ফলে মানুষের মনে সৃষ্টি হয় সংশয়বাদ। নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেই সে সন্দেহের গোলক ধাঁধায় পড়ে যায়। সে নিজকে এমন পুতুল মনে করে যাকে অন্য কেউ আড়ালে বসে নাচাচ্ছে। চিন্তার এমন আবর্তে পতিত মানুষ জীবনের কোন উদ্দেশ্যই খুঁজে পায় না। সে মনে করে যে তার কিছুই করার নেই। সার্বিক সত্তা যেই দিকে যাচ্ছে সেও সেই দিকেই যাচ্ছে।

এই মতবাদের বিশ্বাসীদেরকেও প্রবৃত্তির দাসত্ব করতেই দেখা যায়। প্রবৃত্তি তাদেরকে যেই দিকে চালিত করে তারা সেই দিকেই ছুটে চলে।

বৈরাগ্যবাদ

জাহিলিয়াহর ভিন্ন একটি রূপ হচ্ছে রাহ্বানিয়াত বা বৈরাগ্যবাদ।

এই মতবাদ এই ধারণা ব্যক্ত করে যে মানুষের জন্য এই পৃথিবী হচ্ছে একটি শাস্তি ভোগের স্থান। এখানে মানুষের অবস্থান দন্ড-প্রাপ্ত কয়েদীর মতো। কামনা-বাসনা, আমোদ-আহ্লাদ, দৈহিক আরাম ও দেহের দাবি হচ্ছে এই কারাগারের বেড়ি ও শিকল। মানুষ এই পৃথিবীর বস্তুগুলোর সাথে যতো বেশি জড়িত হবে ততো বেশি আবর্জনা দ্বারা পরিবেষ্টিত হবে। মানুষের মুক্তির পথ যাবতীয় আমোদ-আহ্লাদ থেকে মুক্ত হওয়া, কামনা-বাসনা দমন করা ও দেহের চাহিদাগুলোকে তপস্যা-সাধনার মাধ্যমে পীড়ন করা। এই পীড়নের ফলে আত্মা পবিত্র হয়।

বৈরাগ্যবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা দুনিয়ার ঝামেলা থেকে দূরে সরে থেকে অসৎ ব্যক্তিদের জন্য পথ উন্মুক্ত করে দেয়। বৈরাগ্যবাদী সৎ লোকেরা তপস্যা-সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আর অসৎ লোকেরা দুনিয়ার কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে ফিতনা-ফাসাদের বিস্তৃতি ঘটায়। বৈরাগ্যবাদের প্রভাবে মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। সমাজনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। আর সেই জন্যই অসৎ শাসকদেরকে জোরে সোরে বৈরাগ্যবাদী জীবন দর্শনের পৃষ্ঠপোষকতা করতে দেখা যায়। প্রকৃত পক্ষে এই মতবাদ জনগণকে যালিম ব্যক্তিদের প্রতি বিনয়াবনত ও পোষমানা বানাবার জন্য যাদুর মতো কাজ করে। কখনো কখনো দেখা যায় দুনিয়া ত্যাগের আবরণে বৈরাগ্যবাদীরা দারুণ দুনিয়া পূজারী হয়ে উঠে।

ইসলাম

পরিশেষে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ইসলামের জীবন দর্শন ও তার অনুসৃতির সুফলের ওপর আলোকপাত করেন।

ইসলাম এই ধারণা ব্যক্ত করে যে বিশ্বজাহান এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর সাম্রাজ্য। তিনি এটি সৃষ্টি করেছেন। তিনিই এটি পরিচালনা করছেন। সমস্ত ক্ষমতা তাঁর হাতে কেন্দ্রিভূত। মানুষ এই সম্রাটের প্রজা। এই সাম্রাজ্যের অংশ হওয়ার কারণে সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ যেইভাবে সম্রাটের আনুগত্য করে চলছে মানুষের কর্তব্য সেইভাবে তাঁর আনুগত্য করে চলা। মানুষ নিজের জন্য জীবন বিধান তৈরি করার ও নিজের কর্তব্য নিজেই স্থির করার অধিকার রাখে না। তার কাজ হচ্ছে “আল মালিকুল মুলকের” নির্দেশ পালন করা।

দুনিয়ার জীবন মানুষের পরীক্ষাগার। সম্রাট নিজে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছেন। কারণ, আল্লাহ মানুষকে যেই জ্ঞান বুদ্ধি ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন এবং অগণিত সৃষ্টির ওপর কর্তৃত্ব করার ইখতিয়ার দিয়েছেন, এর মাধ্যমে তিনি মানুষকে পরীক্ষা করছেন।

পৃথিবীর জীবন পরীক্ষাকাল। তাই এখানে হিসাব নেই, শাস্তি নেই, পুরস্কার নেই। হিসাব, শাস্তি কিংবা পুরস্কারের জন্য যেই সময়টি নির্দিষ্ট তার নাম আখিরাত।

যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ মানুষের মনোমাঝে এই চিন্তা-চেতনারই বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন।

কোন একটি ভুখন্ডের মানুষ যখন এই মতবাদ গ্রহণ করে তখনই তার প্রতিফলন ঘটে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, লেনদেন, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি– তথা জীবনের সকল দিক ও বিভাগে। পবিত্রতা, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, জীবন যাপন পদ্ধতি, সামাজিক রীতিনীতি, ব্যক্তিগত চরিত্র, জীবিকা উপার্জন, অর্থব্যয়, অর্থ বন্টন, দাম্পত্য জীবন, পারিবারিক জীবন, বৈঠকী নিয়ম-কানুন, সরকার গঠন, বিচার, অপরাধ দমন, কর ধার্য, জনকল্যাণমূলক কাজ, শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষাব্যবস্থা, সেনাবাহিনী গঠন,যুদ্ধ-পরিচালনা, সন্ধি স্থাপন-সব কিছুতেই বিকশিত হয় এই বিশেষ দৃষ্টিভংগি।

এই মতবাদ মানুষের জীবনকে দায়িত্ব-জ্ঞান-সম্পন্ন ও সুশৃংখল করে তোলে। এই মতবাদের বিশ্বাসী মানুষ মনে করে যে তার দেহ, তার সকল শক্তি সামর্থ ও চারদিকে ছড়িয়ে থাকা সম্পদ সম্ভারের মালিক সে নয়। এই সব কিছুর মালিক আল্লাহ। এইগুলো মালিকের পক্ষ থেকে তার নিকট আমানত হিসেবে রাখা হয়েছে। এই আমানতের হিসাব একদিন তাকে অবশ্যই আল্লাহর নিকট দিতে হবে। এই ধারণা মানুষকে বলগাহীন জীবন যাপন করতে দেয় না। তাঁকে প্রবৃত্তির দাস হতে দেয় না। সে অত্যাচারী ও বিশ্বাসঘাতক হতে পারে না। সে হয় একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি।

এই মতবাদ মানুষকে সংগ্রামী ও অবিশ্রান্ত চেষ্টানুবর্তী করে তোলে। তাকে স্বার্থপরতা, আত্মপূজা ও জাতি পূজার পংকিলতা থেকে পবিত্র করে। তাকে সততা, সত্যনিষ্ঠা, উন্নত নৈতিক আদর্শের পথে সংশ্লিষ্ট রাখে। এই মতবাদ অনুযায়ী সকল মানুষ আল্লাহর প্রজা। সকলের মর্যাদা, অধিকার ও সুযোগ সুবিধা লাভের সম্ভাবনা সমান। কোন ব্যক্তি, পরিবার, শ্রেণী বা জাতির অন্যান্য মানুষের ওপর কোন আভিজাত্য নেই, শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এইভাবে এই মতবাদ মানব-প্রভুত্বের ধারণার

মূলোচ্ছেদ করে। এই মতবাদ আঞ্চলিক ও বর্ণভিত্তিক বৈষম্য বিদ্বেষেরও মূল্যোৎপাটন করে। এই মতবাদের দৃষ্টিতে পৃথিবীর মালিক আল্লাহ। সকল মানুষ আদমের সন্তান। সকলেই একমাত্র আল্লাহর বান্দা। এই মতবাদের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি আল্লাহভীতি, সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যের জন্য সংগ্রামশীলতা। এই মতবাদের দৃষ্টিতে যারা মানব রচিত বিধান প্রত্যাখ্যান করে একমাত্র আল্লাহ-প্রদত্ত বিধানের আনুগত্য করে তারা সকলে মিলে, একটি দল আর যারা তা করে না তারা ভিন্ন দল। পার্থক্যের এই একটিমাত্র ভিত্তি ছাড়া আর সব ভিত্তিই পরিত্যাজ্য।

এই মতবাদের ভিত্তিতে যেই রাষ্ট্র গড়ে উঠে সেই রাষ্ট্রের বুনিয়াদ হয় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। এই রাষ্ট্রে আল্লাহর শাসন কায়েম হয়, আল্লাহর আইন চালু হয়। এই রাষ্ট্রে মানুষ আল্লাহর খালীফাহ্ বা প্রতিনিধি রূপে কাজ করে। এই রাষ্ট্রের গোটা ব্যবস্থাই ইবাদাত ও তাকওয়ার পবিত্র ভাবধারায় পরিপূর্ণ হয়। শাসক ও শাসিত উভয়েই সমানভাবে অনুভব করে যে তারা আল্লাহর হুকুমাতের অধীনে জীবন যাপন করছে এবং তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু আল্লাহর সাথেই সম্পর্কিত। এই রাষ্ট্রের কর দাতা মনে করে যে সে আল্লাহকেই কর দিচ্ছে। করগ্রহিতা মনে করে যে সে আমানতদার মাত্র। একজন সিপাই থেকে শুরু করে বিচারপতি কিংবা শাসক পর্যন্ত সকলেই ঠিক সেই মনোভাব নিয়ে কর্তব্য পালন করে যেই মনোভাব নিয়ে তারা সালাত আদায় করে থাকে। এই উভয় প্রকার কাজকেই তারা ইবাদাত মনে করে। এই রাষ্ট্রে গণ-প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাদের তাকওয়া, আমানতদারী, সততা, সত্যবাদিতা ও অন্যান্য মহৎগুণ সন্ধান করা হয়। ফলে উন্নত নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তিরাই নেতৃত্ব লাভ করেন ও দায়িত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত হন।

(দ্রষ্টব্য ঃ ইসলাম ও জাহিলিয়াত, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী)

২৩. জামায়াতে ইসলামী গঠন

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী একটি সত্যনিষ্ঠ সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন। মাসিক তারজুমানুল কুরআনের মাধ্যমে তিনি এই মর্মে একটি আবেদন পেশ করেন। যাঁরা মহানবীর (সা) অনুকরণে একটি সংগঠন গড়ে তুলতে আগ্রহী তিনি তাঁদেরকে ইসলামীয়া পার্কে অবস্থিত "তারজুমানুল কুরআনের" অফিসে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান।

১৯৪১ সনের ছাব্বিশে অগাস্ট পঁচাত্তর জন ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত হয় জামায়াতে ইসলামী। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী নব গঠিত সংগঠনের একটি খসড়া

সংবিধান পেশ করেন। সম্মেলন উক্ত সংবিধান অনুমোদন করে। অতপর সেই সংবিধান অনুযায়ী আমীর নির্বাচনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। সর্ব সম্মতিক্রমে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী জামায়াতে ইসলামীর আমীর নির্বাচিত হন।

এই সম্মেলনের এক পর্যায়ে তিনি যেই বক্তব্য রাখেন তা ছিলো অসাধারণ। বক্তব্যের একাংশে তিনি বলেন,

"জামায়াতে ইসলামীতে যাঁরা যোগদান করবেন তাঁদেরকে এই কথা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে জামায়াতে ইসলামীর সামনে যেই কাজ রয়েছে তা কোন সাধারণ কাজ নয়। দুনিয়ার গোটা ব্যবস্থা তাঁদেরকে পাল্টে দিতে হবে। দুনিয়ার নীতি নৈতিকতা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রতিটি কিছু পরিবর্তন করে দিতে হবে। দুনিয়ায় আল্লাহ-দ্রোহিতার ওপর যেই ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে তা বদলিয়ে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর কায়েম করতে হবে। সকল শাইতানী শক্তির বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম।... প্রতিটি পদক্ষেপের পূর্বে তাঁদেরকে ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে তাঁরা কোন কঠিন পথে পা বাড়াচ্ছেন।"

উল্লেখ্য যে তখন গোটা উপ-মহাদেশের জনসংখ্যা প্রায় চল্লিশ কোটি। ত্রিশ কোটি ছিলো অ-মুসলিম। মুসলিমদের সংখ্যা ছিলো দশ কোটি। এদের বিরাট অংশ ছিলো নামকাওয়াস্তে মুসলিম। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সংগঠিত হয়েছিলেন মাত্র পঁচাত্তর জন লোক। তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা দিলেন, "দুনিয়ার গোটা ব্যবস্থা তাঁদেরকে পাল্টে দিতে হবে।"

স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের কেউ কেউ হয়তো তাঁকে বদ্ধ পাগলই মনে করেছিলেন। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ও দূরদর্শী সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ভালো করেই জানতেন যে সকল বিপ্লবের গোড়াতে প্রথমে তো থাকেন একজন মাত্র মানুষ। আর সেই মানুষটিকে কেন্দ্র করেই কালক্রমে গড়ে উঠে বিশাল কাফিলা।

২৪. জামালপুরে কেন্দ্রীয় অফিস স্থানান্তর

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী শহরের কোলাহলমুক্ত এমন একটি স্থানে জামায়াতে ইসলামীর অফিস স্থানান্তরের কথা ভাবছিলেন যেখানে শান্ত মনে গবেষণা কাজ করা যায় এবং ইসলামের আলোকে একটি জনপদও গড়ে তোলা যায় যা অন্য সব জনপদের জন্য হবে একটি মডেল। এই খবর জানতে পেরে চৌধুরী নিয়ায আলী জামালপুরের দারুল ইসলাম ট্রাস্টেই জামায়াতে ইসলামীর অফিস স্থানান্তরের প্রস্তাব দেন। বিষয়টি জামায়াতে ইসলামীর মাজলিসে শূরায় আলোচিত হয় এবং চৌধুরী সাহেবের প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হয়।

১৯৪২ সনের জুন মাসে জামালপুরে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় অফিস স্থানান্তরিত হয়। প্রায় চার বছর পর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আবার জামালপুর আসেন। এই সময় জামায়াতে ইসলামী দাওয়াত পৌঁছানো, শাখা বাড়ানো ও জনশক্তির মান বাড়ানোর জন্য ব্যাপক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিলো। বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে থাকে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এই সব সম্মেলনে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিয়ে জনশক্তিকে দিক-নির্দেশনা দিতে থাকেন।

২৫. প্রথম কেন্দ্রীয় সম্মেলন

১৯৪৫ সনের ১৯, ২০ ও ২১শে এপ্রিল জামালপুরের দারুল ইসলামে জামায়াতে ইসলামীর প্রথম কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গোটা উপ-মহাদেশ থেকে আগত আট শতাধিক ডেলিগেট উপস্থিত ছিলেন এই সম্মেলনে।

সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী "ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতির" ওপর আলোকপাত করেন। ভাষণের একাংশে তিনি বলেন,

● "আমরা সাধারণত সকল মানুষকে বিশেষ করে মুসলিমদেরকে আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করা আহ্বান জানাই।"

● "যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করার কিংবা ইসলাম মেনে চলার কথা বলেন আমরা তাঁদের সকলকে বৈসাদৃশ্য দূর করে ইসলামের পূর্ণ অনুসারী হবার আহ্বান জানাই।"

● "আমরা তাঁদেরকে আল্লাহদ্রোহী নেতৃত্বের অবসান ঘটিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব আল্লাহভীরু লোকদের হাতে সুফর্দ করার আহ্বান জানাই।"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা- ৬

কর্মনীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন,

"যাঁরা আমাদের দাওয়াত কবুল করেন আমরা তাঁদেরকে কার্যত আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল জীবন গড়ে তুলতে এবং এই কাজে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার প্রমাণ পেশ করতে বলি।

ঈমানের বিপরীত সকল কাজ থেকে তাঁদের জীবনকে পবিত্র করতে বলি। এখান থেকেই তাঁদের চারিত্রিক বিশুদ্ধির কাজ ও এর যাচাই শুরু হয়ে যায়। যাঁরা উচ্চ লক্ষ্য সামনে রেখে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছেন তাঁদেরকে নিজেদের রচিত স্বপ্ন-প্রাসাদ নিজের হাতেই ধূলিসাৎ করে দিতে হয় এবং এমন এক জীবন ক্ষেত্রে নামতে হয় যাতে সম্মান, পদমর্যাদা, আর্থিক স্বাচ্ছন্দের সম্ভাবনা কেবল নিজেদের জীবনেই নয় পরবর্তী কয়েক পুরুষ পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয় না। আর যাঁদের আর্থিক সচ্ছলতা, লুণ্ঠিত সম্পদ, অংশীদারদের অপহৃত অংশ ও উত্তরাধিকারীদের হক নষ্ট

করা সম্পত্তির ওপর স্থাপিত, এই আন্দোলনের যোগদানের ফলে সেই সব ত্যাগ করে তাঁদেরকে সর্বহারা সাজতে হয়। কারণ, তাঁরা যেই আল্লাহকে নিজেদের মালিক ও মনিব হিসেবে মেনে নিয়েছেন তিনি কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা পছন্দ করেন না।... কার্যত এই আদর্শ গ্রহণ করলে প্রত্যেক ব্যক্তির আপনজন তাঁর দুশমন হয়ে পড়ে। তাঁর আব্বা-আম্মা, ভাই-বন্ধু, স্ত্রী-সন্তান ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়রাই সর্ব প্রথম তাঁর ঈমানের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। এই আদর্শ গ্রহণ করার সংগে সংগে বহু লোকের শান্তিপূর্ণ ও স্নেহময় নীড় বোলতার বাসায় পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের এটিই সর্ব প্রথম ট্রেনিং সেন্টার।... এই প্রাথমিক পরীক্ষায় যাঁরা ব্যর্থ হন আন্দোলন ও সংগঠন থেকে তাঁরা আপনা আপনি ঝরে পড়েন। যাঁরা এতে সাফল্য অর্জন করেন তাঁরা নিজেদের নিষ্ঠা, একাগ্রতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ় সংকল্প, সত্য প্রীতি ও মজবুত স্বভাব-প্রকৃতির অস্তিত্ব প্রমাণ করেন যা আল্লাহর পথে প্রাথমিক পদক্ষেপ ও পরীক্ষার প্রথম অধ্যায় অতিক্রম করার জন্য একান্ত অপরিহার্য।"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা- ২১ ও ২২।

"দ্বিতীয়ত জামায়াতে ইসলামীর সদস্যদের ওপর আদর্শ প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। যেই সত্যের আলো তাঁরা লাভ করেছেন তা তাঁদের সন্নিকটবর্তী সকল মানুষের মধ্যে বিকীর্ণ করা তাঁদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।... এখানে আবার নতুন পরীক্ষা শুরু হয়। এই প্রচারমূলক কাজের চাপে প্রচারকের নিজের জীবনই সংশোধিত হতে থাকে। কারণ এই কাজ শুরু করলে অসংখ্য দূরবীণ ও সার্চ লাইট তাঁর জীবন ও চরিত্রের দিকে উত্তোলিত হয়। ফলে প্রচারকের জীবনে ঈমান বিরোধী সামান্য কিছু থাকলেও এই বিনা পয়সার সংশোধন প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাঁর নিজের নিকট তা স্পষ্ট হয়ে উঠে ও অনবরত চাবুক লাগিয়ে তাঁর জীবনকে নির্মল করে তোলে।

প্রচারক যদি আসলেই ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে ঈমান এনে থাকেন, তাহলে এই সমালোচনায় মোটেই ক্ষিপ্ত হবেন না ও গোঁজামিল দিয়ে নিজের ভুল গোপন করার চেষ্টা করবেন না। বরং লোকদের এই সমালোচনার আলোকে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে চেষ্টিত হবেন।"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা ২২ ও ২৩।

"আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে আমরা কর্মীদেরকে আল কুরআনে উপস্থাপিত কর্মনীতিই শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেছি। অর্থাৎ যুক্তি, জ্ঞান-বুদ্ধি ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে লোকদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানানো। ক্রমধারা অনুসরণ করে অত্যন্ত

স্বাভাবিকভাবে লোকদেরকে দীন ইসলামের বুনিয়াদী নীতিগুলো ভিত্তি করে জীবন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা। কাউকে সাধ্যাতীত খোরাক দান, মৌলিক বিষয়ের পূর্বে খুঁটিনাটি বিষয় পেশ করা, মৌলিক ত্রুটি দূর করার পরিবর্তে বাহ্যিক ত্রুটি দূর করার চেষ্টা করে সময় নষ্ট করার মতো অবৈজ্ঞানিক কাজ করতে কর্মীদেরকে নিষেধ করা হয়। বিভ্রান্ত লোকদের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা মিশ্রিত আচরণ না করে সুদক্ষ ডাক্তারের মতো সহানুভূতি ও কল্যাণ কামনাসহ তাদের প্রকৃত রোগের চিকিৎসা করার চেষ্টা চালানোই আমাদের কাজ। ভর্ৎসনা ও পাথর নিক্ষেপের উত্তরে কল্যাণকর কাজ করতে শেখা, যুলুম-নির্যাতনের মুখে ছবর অবলম্বন করা, যারা অজ্ঞতাবশতঃ কুতর্ক করে তাদের সাথে বিবাদে লিপ্ত না হওয়া, নিরর্থক কথাবার্তাকে মহান ব্যক্তির মতো উপেক্ষা করা আমাদের কর্মীদের বৈশিষ্ট। সত্য থেকে যারা দূরেই থাকতে চায় তাদের পেছনে লেগে থাকার চেয়ে সত্য-সন্ধানী ব্যক্তিদের দিকে বেশী মনোযোগ দেয়া কর্তব্য।"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা ২৪

"সকল কাজ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা এবং প্রতিদান একমাত্র আল্লাহর কাছে পাওয়ার আশা করা আমাদের কর্মীদের কর্তব্য। তাঁদের মনে এই ধারণা জাগ্রত থাকা দরকার যে আল্লাহ তাঁদের সকল কাজ দেখছেন এবং তিনি তাঁদের কাজের মূল্য অবশ্যই দেবেন। দুনিয়ার মানুষ এর মূল্য বুঝুক আর না বুঝুক, মানুষ কোন সুফল দিক আর না দিক তাতে কিছু যায় আসে না। আর এমন কর্মনীতিতে অসাধারণ ধৈর্য সহিষ্ণুতা ও অবিশ্রান্ত চেষ্টা-সাধনার প্রয়োজন।'

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা ২৫

"অনেক লোকের মধ্যে একটি তীব্র গতিশীল কর্মনীতি গ্রহণ করে অবিলম্বে বিরাট কিছু করে দেখাবার আকাঙ্খা দেখা যায়। প্রকৃত পক্ষে এটি চিন্তাহীন কর্মের প্রাচীন রোগ ছাড়া আর কিছুই নয়।"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা ৩৬

"আমাদের কর্মনীতি যে অত্যন্ত ধৈর্য সাপেক্ষ, মন্থর এবং অচিরেই তাতে কোন অনুভবযোগ্য ফল লাভের আশা করা যায় না- বরং তাতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে সাধনা করে যেতে হয়- এতে একটুও সন্দেহ নেই।"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা ৩৭

২১ এপ্রিল সমাপ্ত হয় জামায়াতে ইসলামীর এই কেন্দ্রীয় সম্মেলন। সমাপ্তি ভাষণে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী নেতৃত্বের গুরুত্ব, মৌলিক মানবীয় গুণ ও ইসলামী নৈতিকতা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেন। ভাষণের একাংশে তিনি বলেন,

"একটি গাড়ি সেই দিকেই ছুটে চলে যেই দিকে ড্রাইভার এটিকে চালিয়ে নেয়। গাড়ির আরোহীরা ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সেই দিকেই ভ্রমণ করতে বাধ্য হয়। অনুরূপভাবে মানব সমাজের গাড়িও সেই দিকেই চলতে থাকে যেই দিকে সমাজের নেতারা ও কর্তৃত্বশীল লোকেরা তাকে নিয়ে যায়।"

"পৃথিবীর যাবতীয় উপায় উপকরণ যাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, ক্ষমতা-ইখতিয়ারের চাবি-কাঠি যাদের হাতে থাকে, জনগণের জীবনধারা যাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, চিন্তাধারা, মতবাদ ও আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য উপায়-উপদান যাদের হাতে থাকে, ব্যক্তিগত স্বভাব-চরিত্র পুনর্গঠন এবং সমষ্টিগত নীতি-ব্যবস্থার বাস্তবায়ন ও নৈতিক মূল্যবোধ নির্ধারণের ক্ষমতা যাদের থাকে, তাদের অধীনে জীবন যাপনকারী মানুষেরা সমষ্টিগতভাবে তাদের বিপরীত দিকে কিছুতেই চলতে পারে না। এই নেতৃবৃন্দ ও কর্তৃত্বশীল লোকেরা যদি আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল, সৎ ও সত্যাশ্রয়ী হয় তাহলে সেই সমাজের লোকদের জীবনের সব কিছুই আল্লাহ ভীতি ও সার্বিক কল্যাণের উপর গড়ে উঠে। অসৎ ও পাপী লোকেরাও সেই সমাজে সৎ ও পুণ্যবান হতে বাধ্য হয়। সৎ ব্যবস্থা ও কল্যাণকর রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠান বিকশিত হয়। পাপ ও অন্যায় নিঃশেষ হয়ে না গেলেও অন্তত বিকশিত হতে পারে না। পক্ষান্তরে নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যদি আল্লাহদ্রোহী, ফাসিক ও পাপী লোকদের হাতে থাকে, তাহলে গোটা ব্যবস্থা আল্লাহদ্রোহিতা, যুল্ম-নির্যাতন, অন্যায়-অনাচার ও অসচ্চরিত্রতার পথে চলতে থাকে। চিন্তাধারা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, পারস্পরিক সম্পর্ক, আইন-বিচার-তথা সব কিছুই বিপর্যস্ত হয়। পাপ ও অন্যায় ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়। সত্য, ন্যায় ও কল্যাণ বিদায় নেয়। আল্লাহর এই যমীন যুল্ম-নির্যাতন ও শোষণের সয়লাব স্রোতে কানায় কানায় ভরে উঠে। এমন পরিবেশে অন্যায়ের পথে চলা হয় সহজ, সত্য ও ন্যায়ের পথে শুধু চলা নয় দাঁড়িয়ে থাকাও হয় অত্যন্ত কঠিন।"

এই ভাষণের আরেক অংশে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী মৌলিক মানবীয় গুণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

"ঈমানদার, কাফির, নেক্কার, বদকার, কুসংস্কারাচ্ছন্ন কিংবা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী যে যাই হোক না কেন তার মধ্যে যদি ইচ্ছাশক্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ শক্তি, প্রবল বাসনা, উচ্চ আশা, নির্ভীকতা, বীরত্ব, দৃঢ়তা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, পরিশ্রম প্রিয়তা, লক্ষ্য অর্জনের জন্য সব কিছু কুরবানী করার মনোভংগি, সতর্কতা, দূরদৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি, বিচার ক্ষমতা, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও তদনুযায়ী কর্মনীতি নির্ধারণের

যোগ্যতা, আবেগ-বাসনা-উত্তেজনার সংযমশক্তি এবং অপরাপর মানুষকে প্রভাবিত, আকৃষ্ট ও কাজে নিয়োজিত করার বিচক্ষণতা পুরোমাত্রায় থাকে, তবে এই দুনিয়ায় তার সফলতা সুনিশ্চিত।

"সেই সংগে এমন কিছু গুণও তার থাকা চাই যেইগুলো মানব-সমাজে তার সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে। আত্মসম্মান বোধ, বদান্যতা, দয়া-অনুগ্রহ, সহানুভূতি, ঔদার্য, প্রশস্ত চিত্ততা, নিরপেক্ষতা, দৃষ্টির উদারতা, সত্যবাদিতা, বিশ্বাসপরায়ণতা, ন্যায় নিষ্ঠা, ওয়াদাপূরণ, সভ্যতা-ভব্যতা প্রভৃতি এইগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।"

"কোন মানবগোষ্ঠীর অধিকাংশের মধ্যে যদি উল্লেখিত গুণগুলোর সমাবেশ ঘটে, তাহলে বলতে হবে যে মানবতার আসল মূলধনই তাদের অর্জিত হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী সমাজ সংস্থা গড়ে তোলা সহজ সাধ্য হবে। তবে এই মূলধনের সামাজিক রূপ লাভের জন্য আরো কিছু নৈতিক গুণের সম্মিলন প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সমাজের সকল লোক কিংবা অধিকাংশ লোক একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে চূড়ান্ত লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করবে। সেই লক্ষ্যকে তারা তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির চেয়েও বেশি ভালোবাসবে, তাদের মাঝে পারস্পরিক সৌহার্দ থাকবে ও মিলেমিশে কাজ করার মনোভংগি থাকবে, উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য সংঘবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালাতে যতোখানি আত্মত্যাগ অপরিহার্য তা করতে তারা প্রস্তুত থাকবে, ভালো ও মন্দ নেতার মধ্যে পার্থক্য করার মতো বুদ্ধিমত্তা থাকবে... নেতার নির্দেশ পালনে অভ্যস্ত হতে হবে... গোটা জাতির চেতনা এতোখানি তীব্র থাকতে হবে যে কল্যাণকর বিষয়ের বিপরীতে ক্ষতিকর কোন কিছুকে বরদাশত করবে না।"

আরো সামনে এগিয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ইসলামী নৈতিকতার ওপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, "ইসলাম মৌলিক মানবীয় গুণকে নির্ভুল কেন্দ্রের সাথে যুক্ত করে দেয়।... মৌলিক মানবীয় গুণ প্রথম অবস্থায় নিরপেক্ষ একটি শক্তি রূপেই থাকে। এই অবস্থায় তা ভালোও হতে পারে, মন্দও হতে পারে, কল্যাণের হাতিয়ার হতে পারে, অকল্যাণের হাতিয়ারও হতে পারে। যেমন একটি শাণিত তলোয়ার। ডাকাতের হাতে পড়লে তা যুল্‌ম-পীড়নের হাতিয়ারে পরিণত হয়। আল্লাহর পথের মুজাহিদদের হাতে পড়লে তা কল্যাণের হাতিয়ারে পরিণত হয়।"

"ইসলাম মানুষের গোটা জীবন ও তার অন্তর্নিহিত শক্তিগুলোকে এইভাবেই নিয়ন্ত্রিত ও সংশোধিত করে। এই সংশোধনের ফলে মৌলিক মানবীয় গুণগুলো সঠিক পথে পরিচালিত হয় ও ব্যক্তি স্বার্থ, বংশ, পরিবার কিংবা জাতির শ্রেষ্ঠত্ব

বিধানের জন্য ব্যয়িত না হয়ে সত্যের বিজয় নিশ্চিত করার জন্য সংগতভাবে ব্যয় হতে থাকে।"

"পৃথিবীর বুকে ইসলামী নৈতিকতা ও মৌলিক মানবীয় গুণ সমৃদ্ধ এবং জাগতিক উপায় উপকরণ সঠিকভাবে ব্যবহারকারী একটি সুসংগঠিত দল বর্তমান না থাকলে আল্লাহ দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের চাবিকাঠি এমন একটি দলের হাতে ন্যস্ত করেন যেই দলটি অন্তত মৌলিক মানবীয় গুণে ভূষিত ও জাগতিক উপায়-উপকরণ ব্যবহার করার দিক দিয়ে অন্য দলগুলোর তুলনায় অধিক অগ্রসর।... কিন্তু দুনিয়ায় যদি এমন একটি সুসংগঠিত দল সত্যিই বর্তমান থাকে যেটি ইসলামী নৈতিকতা ও মৌলিক মানবীয় গুণে অন্যান্য সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর এবং জাগতিক উপায়-উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অন্যদের চেয়ে পশ্চাৎপদ নয়, তাহলে দুনিয়ার নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের চাবিকাঠি অন্য দলের হাতে অর্পিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার।"

"এই কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে ঐরূপ একটি দলের উপস্থিতিই নেতৃত্ব ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটার জন্য যথেষ্ট নয়। ব্যাপার এমন নয় যে এই দিকে এই রূপ একটি দল অস্তিত্ব লাভ করবে, আর ঐদিকে আসমান থেকে একদল ফিরিশতা নেমে কাফির ও ফাসিকদেরকে নেতৃত্বের আসন থেকে হটিয়ে এদেরকে সেই আসনে বসিয়ে দেবে। এইরূপ অস্বাভাবিক নিয়মে মানব সমাজে কখনোই কোন পরিবর্তন ঘটে না। নেতৃত্ব ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে, প্রত্যেক কদমে কাফির ও ফাসিক শক্তির সাথে মুকাবিলা করতে হবে এবং সত্য প্রতিষ্ঠার বন্ধুর পথে সকল প্রকার কুরবানী দিয়ে সত্য প্রীতির ঐকান্তিকতা ও অপ্রতিভ যোগ্যতারও প্রমাণ পেশ করতে হবে।"

অতপর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ইসলামী নৈতিকতার চারটি পর্যায় ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন,

"আল কুরআন ও আল হাদিসের শিক্ষা অনুযায়ী এর চারটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম ঈমান, দ্বিতীয় ইসলাম, তৃতীয় তাকওয়া ও চতুর্থ ইহসান। এই চারটি পর্যায়ের পরবর্তীটি পূর্ববর্তীটির থেকে উদ্ভূত ও এরই ওপর প্রতিষ্ঠিত।"

ঈমান

"এটি ইসলামী জিন্দিগীর বুনিয়াদ।... পরিপূর্ণ ইসলামী জিন্দিগী গঠনের জন্য সুবিস্তারিত, সম্প্রসারিত, সুগভীর ও সুদৃঢ় ঈমান অত্যাবশ্যক। ঈমানের ব্যাপ্তি থেকে জীবনের কোন একটি দিক বা বিভাগও যদি বাইরে থাকে, তাহলে জীবনের সেই

দিক বা বিভাগ পুনর্গঠিত হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। ঈমানের গভীরতায় যতোটুকু অভাব থাকে ইসলামী জিন্দিগীর প্রাসাদও সেই অনুযায়ী দুর্বল থাকে।"

"বস্তুত ইসলামী জিন্দিগীর বিশাল প্রাসাদ একমাত্র সেই তাওহীদ স্বীকৃতির ওপরই স্থাপিত হতে পারে যা মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের ওপর সম্প্রসারিত, যার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজকে ও অন্য সব কিছুকে 'আল্লাহর মালিকানা বলে মনে করে, মানুষ সেই আল্লাহকেই মালিক, মা'বুদ, প্রভু ও আদেশ-নিষেধের নিরংকুশ অধিকারী বলে মেনে নেয়, জীবন-বিধানের উৎস একমাত্র তাঁকেই মনে করে, আল্লাহর আনুগত্য বিমুখতাকে কিংবা আল্লাহর সত্তা (যাত), গুণ (সিফাত), অধিকার (হক) ও ইখতিয়ারে (ক্ষমতা) অন্যের অংশীদারিত্ব স্বীকার করাকে মারাত্মক ভ্রান্তি ও গুমরাহী বলে মেনে নেয়।"

"এই প্রাসাদ তখনই মজবুত হওয়া সম্ভব যখন মানুষ স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে তার নিজ সত্তা ও ধন-সম্পদ আল্লাহর জন্য কুরবান করার সিদ্ধান্ত নেয়, নিজের মনগড়া ভালমন্দের মানদন্ড চূর্ণ করে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তোষ ও অসন্তোষকেই মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করে, নিজের ধ্যান-ধারণা, বাসনা ও চিন্তাধারাকে একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে ঢেলে গঠন করে, যেই সব কাজের দ্বারা আল্লাহর নাফরমানী হয় সেইগুলো পরিত্যাগ করে, আল্লাহর ভালোবাসাকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়, বন্ধুতা ও শত্রুতা, পছন্দ-অপছন্দ, যুদ্ধ-সন্ধি সব কিছুকেই আল্লাহর মর্জির অধীন করে দেয়। আল্লাহর প্রতি ঈমানের নিগূঢ় অর্থ এটাই।"

"এই নিরিখে ঈমানের অন্য দিকগুলোও পরখ করা যেতে পারে। মানুষ যেই পর্যন্ত না জীবনের সকলক্ষেত্রে নবীকে একমাত্র নেতা ও পথপ্রদর্শক হিসেবে মেনে নেয়, তাঁর নেতৃত্ব বিরোধী যতো নেতৃত্ব প্রচলিত আছে তা প্রত্যাখ্যান না করে ততক্ষণ পর্যন্ত রাসূলের প্রতি ঈমান পূর্ণ হতে পারে না। আল্লাহর কিতাবে উপস্থাপিত জীবন-বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধানকে প্রতিষ্ঠিত দেখে মনে সামান্যতম সন্তুষ্টি ভাব এবং আল্লাহর বিধানকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত দেখার ব্যাপারে ব্যাকুলতার অভাব আল্লাহর কিতাবের প্রতি ঈমান আনার প্রমাণ বহন করে না। অনুরূপভাবে আখিরাতের প্রতি ঈমান ও পূর্ণতা লাভ করতে পারেনা যেই পর্যন্ত না মানুষ দুনিয়ার ওপর আখিরাতকে প্রাধান্য দেয়। আখিরাতে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করার বিশ্বাসই মানুষকে তার প্রতিটি পদক্ষেপে ভাবতে ও সংযত হতে বাধ্য করে।"

ইসলাম

"ইসলাম হচ্ছে ঈমানের বাস্তব অভিব্যক্তি, ঈমানের কর্ম-রূপ। ঈমান ও ইসলামের

সম্পর্ক বীজ ও গাছের সম্পর্কের মতো। বীজের মধ্যে যা কিছু থাকে তা-ই গাছ রূপে আত্মপ্রকাশ করে।"

"সত্যি যদি ঈমান থাকে, তাহলে ব্যক্তির বাস্তব জীবনে, কর্মজীবনে, নৈতিকতায়, গতি বিধিতে, রুচি ও মানসিক ঝোঁক প্রবণতায়,... প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়েও এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কোন একটি ক্ষেত্রে যদি ইসলাম বিরোধী ভাবধারা প্রকাশ পায় তাহলে বুঝতে হবে যে ঐ ক্ষেত্রটি ঈমান শূন্য অথবা ঈমান থাকলেও তা একেবারেই নিস্তেজ। আর কারো বাস্তব জীবন যদি অমুসলিমদের জীবনধারা অনুযায়ী যাপিত হয় তাহলে বুঝতে হবে তার অন্তরে ঈমানের অস্তিত্ব নেই।"

তাকওয়া

"তাকওয়া মনের সেই অবস্থারই নাম যা আল্লাহভীতি ও প্রবল দায়িত্বানুভূতির কারণে সৃষ্টি হয় এবং জীবনের প্রত্যেকটি দিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মপ্রকাশ করে। মানুষ আল্লাহকে ভয় করবে, সে আল্লাহর দাস এই চেতনা তার মনে জাগ্রত থাকবে, তার মনে আল্লাহর সামনে জওয়াবদিহি করার কথা স্মরণ থাকবে, এবং আল্লাহ তাকে পৃথিবীর এই পরীক্ষাগারে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পাঠিয়েছেন এই কথা তার মনে সদা জাগ্রত থাকবে। আখিরাতের ফায়সালা এই নিরিখে হবে যে সে তার শক্তি-সামর্থ-যোগ্যতা কিভাবে প্রয়োগ করেছে, যেই সব নিয়ামাত সে পেয়েছে তার ভোগ-ব্যবহার কিভাবে করেছে, অপরাপর মানুষের সাথে তার সম্পর্ক-কাজকর্ম লেন দেন কেমন ছিলো এই ধারণা তার মনে জাগ্রত থাকবে।"

"এই অনুভূতি ও চেতনা যার মাঝে তীব্রভাবে বর্তমান থাকে তার হৃদয়-মন জাগ্রত হয়। তার ইসলামী চেতনা তেজস্বী হয়। আল্লাহর মর্জির বিপরীত প্রত্যেকটি বিষয়ই তার মনে খটকা সৃষ্টি করে,... তার অন্তর্নিহিত কর্তব্য জ্ঞান তাকে আল্লাহর সকল নির্দেশ পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে পালন করতে বাধ্য করে। কোথাও আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘিত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে আল্লাহর ভয়ে তার পা দুইটি কেঁপে উঠে। আল্লাহর হক ও মানুষের হক রক্ষা করা তার স্বতস্ফূর্ত স্বভাবে পরিণত হয়।"

ইহসান

"এটি ইসলামী জিন্দিগীর সর্বোচ্চ পর্যায়। ইহসান বলা হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ইসলামের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও প্রেম-পাগল ভাবধারাকে যা একজন মুসলিমকে "ফানা ফিল ইসলাম" করে তোলে।... তাকওয়ার মূল কথা হচ্ছে আল্লাহর ভয়। আর ইহসানের মূল কথা হচ্ছে আল্লাহর ভালোবাসা। ইহসান মানুষকে আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্য সক্রিয় করে তোলে।"

তাকওয়া ও ইহসানের পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী একটি চমৎকার উদাহরণ পেশ করেছেন। তিনি বলেন,

"সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক লোক থাকে যারা নিজেদের কর্তব্য দায়িত্বানুভূতি ও আগ্রহ-উৎসাহের সাথে আঞ্জাম দিয়ে থাকে। তারা নিয়মকানুন মেনে চলে। শৃংখলা ভংগ করে না। সরকারের দৃষ্টিতে আপত্তিকর কোন কাজই তারা করে না। আবার, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক লোকও থাকে যারা ঐকান্তিক নিষ্ঠা, আন্তরিক ব্যগ্রতা ও আত্মোৎসর্গের ভাবধারা নিয়ে সরকারের কল্যাণ কামনা করে। তাদের ওপর যেই সব কাজ অর্পিত হয় তারা কেবল সেইগুলোই সম্পন্ন করে না, আরো যেই সব কাজের দ্বারা রাষ্ট্রের কল্যাণ ও উন্নতি হতে পারে, সেই সব কাজও আঞ্জাম দেয়ার জন্য তারা যত্নবান হয়। নির্দিষ্ট কর্তব্যের চেয়ে তারা অনেক বেশি কাজ করে।... কোথাও আইন-শৃংখলা লংঘিত হতে দেখলে তাদের মনে প্রচন্ড আঘাত লাগে। কোথাও রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কোন কিছু দৃষ্টিগোচর হলে তারা অস্থির হয়ে উঠে ও তা দমনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে।... পৃথিবীর সর্বত্র একমাত্র তাদের রাষ্ট্রের জয়জয়কার হোক, সর্বত্র এরই বিজয় পতাকা উড্ডীন হোক- এটাই হয় তাদের মনের বাসনা।"

"এই দুইয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত কর্মচারীরা হয় রাষ্ট্রের মুত্তাকী আর শেষোক্ত কর্মচারীরা হয় মুহসিন।

"ইসলামে মুত্তাকীদেরও যথেষ্ট সম্মান আছে। তারাও শ্রদ্ধাভাজন, সন্দেহ নেই। কিন্তু ইসলামের আসল শক্তি হচ্ছে মুহসিনগণ। আর পৃথিবীতে ইসলামের আসল উদ্দেশ্য একমাত্র মুহসিনদের দ্বারাই সুসম্পন্ন হতে পারে।"

(দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী)

২৬. আযাদী অর্জনের পথে উপ-মহাদেশ

১৯৩৯ সন থেকে ১৯৪৫ সন পর্যন্ত বিস্তৃত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটেনের জনবল ও ধনবল ব্যাপক হারে ক্ষয় হয়। অতো দূর থেকে ভারত শাসন করা তার জন্যে কষ্টকর হয়ে উঠে। অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন, গুপ্ত সমিতিগুলোর সশস্ত্র হামলা, জাপানের সহায়তায় ভারতের বাইরে থেকে সুভাষ চন্দ্র বোসের নেতৃত্বাধীন আযাদ হিন্দু ফৌজ কর্তৃক ভারতের পূর্ব সীমান্তে সামরিক চাপ, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দেয়ার জন্যে ইউনাইটেড স্টেট্স অব এমেরিকার প্রেসিডেন্ট মিঃ রুজভেল্টের পরামর্শ, হিন্দু-মুসলিম দাংগার বিস্তৃতি- সব মিলিয়ে হিসাব নিকাশ করে বৃটিশ সরকার উপ-মহাদেশের আযাদী প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১৯৪৬ সনের মার্চ মাসে বৃটিশ কেবিনেটের সদস্য প্যাথিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স ও এ.ডি. আলেকজান্ডার সমন্বয়ে গঠিত কেবিনেট মিশন আসে ভারতে। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের জন্য পাঠানো হয়েছিলো এই মিশন।

কেবিনেট মিশন গোটা দেশের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি গণ-পরিষদ নির্বাচনের প্রস্তাব দেয়। কেবিনেট মিশন আরো প্রস্তাব দেয় যে উপ-মহাদেশের প্রদেশগুলোকে গ্রুপ-এ, গ্রুপ-বি ও গ্রুপ-সি তে বিভক্ত করা হবে। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো নিয়ে গঠিত হবে গ্রুপ-এ। আর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো নিয়ে গঠিত হবে গ্রুপ-বি ও গ্রুপ-সি।

অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ এই প্রস্তাবকে পাকিস্তান অর্জনের পথে এক ধাপ অগ্রগতি গণ্য করে তা মেনে নেয়। অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস গোটা দেশের জন্য শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি গণ-পরিষদ নির্বাচনের প্রস্তাব মেনে নেয়, কিন্তু প্রদেশগুলোর গ্রুপিং মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। এমতাবস্থায় মুসলিম লীগও সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়।

কেবিনেট মিশনের ব্যর্থতার ফলে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে বিরাজমান তিক্ততার মাত্রা আরো বেড়ে যায়। কলকাতায় লোমহর্ষক দাংগা সংঘটিত হয়।

২৭. দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় সম্মেলন

১৯৪৬ সনের ৫,৬ ও ৭ই এপ্রিলে এলাহাবাদের শহরতলী হারওয়ারা-তে অনুষ্ঠিত হয় জামায়াতে ইসলামীর দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় সম্মেলন। কিডনীর ব্যথার জন্য সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী উদ্বোধনী ভাষণ দিতে পারেন নি। সম্মেলন উদ্বোধন করেন মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী। এই সময় জামায়াতে ইসলামীর রুকন সংখ্যা ছিলো ৪৮৬ জন। তৃতীয় দিন সমাপ্তি ভাষণ পেশ করেন আমীরে জামায়াত সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। ভাষণে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে বৃটিশরা যখন দেশ ছেড়ে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন দেশবাসী একে অপরের ওপর হামলা চালাচ্ছে। তিনি হিন্দু ও মুসলিমদের প্রতি সুস্থ চিন্তা অনুশীলনের আহ্বান জানান এবং বলেন হিন্দু ও মুসলিমরা যখন পৃথক হতেই হবে তখন বন্ধুর মতো পৃথক হওয়া উচিত যাতে ভবিষ্যতে সু-প্রতিবেশী রূপে বসবাস করা সম্ভব হয়। এই ভাষণে তিনি জামায়াতে ইসলামীর রুকনদের প্রতি সর্বাবস্থায় ন্যায়ের পতাকাবাহী হিসেবে ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

২৮. অবশেষে দেশ-ভাগের প্রতি কংগ্রেসের সম্মতি প্রদান

১৯৪৬ সনের ২৫শে অগাস্ট গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়াভেল কলকাতা সফরে আসেন। দাংগার ভয়াবহ পরিণতি দেখে তিনি আঁতকে উঠেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর মুসলিম লীগের শীর্ষ নেতা মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ লর্ড ওয়াভেলের সাথে সাক্ষাত করেন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবির যৌক্তিকতা আবারো তুলে ধরেন। লর্ড ওয়াভেল নীতিগতভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি মেনে নেন।

১৯৪৭ সনের মার্চ মাসের শেষভাগে লর্ড ওয়াভেলের স্থলে গভর্ণর জেনারেল হয়ে আসেন লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন। দুই মাস তিনি উপ-মহাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনিও উপলব্ধি করেন যে দেশ ভাগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

৩রা জুন তিনি পাকিস্তান দাবি মেনে নেয়ার কথা প্রকাশ করেন এবং হিন্দুদেরকে খুশি করার জন্য ঘোষণা করেন যে বেংগল প্রদেশ ও পাঞ্জাব প্রদেশকে বিভক্ত করা হবে।

অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতা জাওহারলাল নেহরু ও সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল ভারত বিভক্তির প্রশ্নে তাঁদের সম্মতির কথা লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনকে জানিয়ে দেন। কিন্তু মিঃ গান্ধী কিছুতেই তা মানতে রাজি হলেন না। তিনি বলেন, "কংগ্রেস যদি বিভক্তি মেনে নিতে চায়, তা আমার মৃত দেহের ওপর দিয়েই হবে। যদ্দিন আমি জীবিত আছি ভারতের বিভক্তি আমি মেনে নেবো না। যদি সম্ভব হয়, আমি কংগ্রেসকে এটা করতে দেবো না।"

জোর লবিং চলতে থাকে। অবশেষে মিঃ গান্ধী তাঁর মত পরিবর্তন করেন।

কংগ্রেসের অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় নেতা মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ভারত বিভক্তির ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেন, "আমি যখন আবার গান্ধীর সাথে দেখা করলাম দেখলাম তিনি পরিবর্তিত হয়ে গেছেন। এতে আমি আমার জীবনের সবচে' বড়ো আঘাত পেলাম। তিনি প্রকাশ্যে বিভক্তির পক্ষে না হলেও বিভক্তির জোর বিরোধিতা করছিলেন না। আমার কাছে যেটা বেদনাদায়ক লাগলো এবং বিস্মিত হলাম এই দেখে যে আগে সরদার প্যাটেল যেই সব যুক্তি দেখিয়ে ছিলেন, গান্ধী সেই সব যুক্তিই দেখাতে লাগলেন। দুই ঘন্টা ধরে আমি তাঁকে বুঝাবার চেষ্টা করি। কিন্তু তাঁর ওপর কোন আছর ফেলতে পারলাম না।"

২৯. হিন্দু-মুসলিম দাংগা ও জামায়াতে ইসলামী

১৯৪৭ সনের ৩রা জুন দেশ-ভাগের পরিকল্পনা প্রকাশ পেলে হিন্দু ভারত ভয়ানক হিংস্র হয়ে উঠে। "অখন্ড ভারতে এক জাতীয়তার ভিত্তিতে দেশ শাসনের সুযোগ নষ্ট হওয়ায় তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হিন্দুদের হিংস্র মানসিকতার ব্যাপক প্রকাশ ঘটে। দেশের সর্বত্র মুসলিম সংখ্যালঘু অঞ্চলগুলোতে হিন্দুদের পক্ষ থেকে চরম বর্বরতা ও পাশবিকতার তান্ডবলীলা শুরু হয়। বিহার প্রদেশে সর্বাধিক লোমহর্ষক

হত্যাকান্ড হতে থাকে। অখন্ড ভারত ও একজাতীয়তার পতাকাবাহীগণ মুসলিমদের জনপদগুলো একটির পর একটি জ্বালিয়ে দিতে থাকে। বহু মানব সন্তানকে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হয়। কয়েক দিনের মধ্যে হাজার হাজার বর্গ মাইল ব্যাপী এলাকার মুসলিমগণ গৃহহারা ও সর্বস্বহারা হয়ে পড়ে।"

দ্রষ্টব্য ঃ জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস, আব্বাস আলী খান, পৃষ্ঠা- ১৯০

হিন্দু-মুসলিম দাংগা শুধু বিহারেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ছড়িয়ে পড়েছিলো উপ-মহাদেশের সর্বত্র। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে করণীয় নির্ধারণের জন্য সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী মাজলিসে শূরার অধিবেশন ডাকেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সারাদেশে দাংগা বিরোধী একটি প্রচারপত্র বিপুল সংখ্যায় বিতরণ করা হয়। সীমিত সামর্থ নিয়েই জামায়াতে ইসলামী দেশের বিভিন্ন স্থানে রিলিফ ক্যাম্প স্থাপন করে বিপন্ন মানুষের খিদমাতে আত্মনিয়োগ করে। একটি সার্কুলারের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামীর রুকনদের বলা হয়, "জামায়াতে ইসলামীর কোন রুকনের সামনে হিন্দু কিংবা মুসলিমদের কোন দলকে কোনব্যক্তির ওপর আঘাত হানতে দেখলে তাকে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। আক্রান্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করতে নিজের জীবন বিপন্ন হলেও তা করা উচিত।"

"দাংগা চলা অবস্থায় কোন ব্যক্তি কিংবা পরিবার যদি বিপন্ন হয়ে পড়ে সেই ব্যক্তি কিংবা পরিবার মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম, তারা আশ্রয়প্রার্থী হোক না হোক নিজের চেষ্টায় সেই ব্যক্তি বা পরিবারকে আশ্রয় দিতে হবে। নিজের জীবনকে বিপন্ন করেও তার বা তাদের হিফাজাত করতে হবে।"

"দাংগা চলাকালে যখনই ও যেখানেই সুযোগ হবে জনসাধারণকে বুঝাবার চেষ্টা করতে হবে, তাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখাতে হবে, মুসলিম হলে তাদেরকে দীনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তা হাছিলের সঠিক পন্থা বলে দিতে হবে। তাদের কাছে এই কথা সুস্পষ্ট করে তুলতে হবে যে এই জাতীয় সংঘাত-সংঘর্ষ, এই ধরনের হত্যাকান্ড কিছুতেই আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় নয়, অমুসলিম হলে তাকে জাতীয়তাবাদের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করে তুলতে হবে।

দ্রষ্টব্য ঃ জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস, আব্বাস আলী খান, পৃষ্ঠা- ১৯৩

৩০. ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রগঠন

১৯৪৭ সনের পহেলা জুলাই বৃটিশ পার্লামেন্ট ইনডিপেনডেন্স অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট পাস করে। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তুতি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা হয়।

১৯৪৭ সনের ১৪ ও ১৫ই অগাস্টের মধ্যবর্তী রাতে দিল্লীতে বসে পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন বৃটিশ শাসিত ভারতের সর্বশেষ গভর্ণর জেনারেল লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন।

স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল হিসেবে দিল্লীতে শপথ গ্রহণ করেন লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন। আর পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল হিসেবে করাচীতে শপথ গ্রহণ করেন মিঃ মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন জাওহারলাল নেহরু। তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্য হন সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ।

পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন লিয়াকত আলী খান। তাঁর মন্ত্রী সভার সদস্য হন মালিক গোলাম মুহাম্মাদ, স্যার জাফরুল্লাহ খান, মুশতাক আহমদ গুরমানী প্রমুখ।

৩১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর হিজরাত

আগেই বলেছি যে তখন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয় পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জিলার পাঠানকোট তহশিলের ছোট্ট পল্লী জামালপুরে অবস্থিত ছিলো। মিঃ র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বাধীন বাউন্ডারী কমিশন প্রথমে ঘোষণা করেছিলো যে গুরুদাসপুর জিলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। ১৯৪৭ সনের ১৭ অগাস্ট বাউন্ডারী কমিশন ঘোষণা করে যে গুরুদাসপুর জিলা ভারতের মধ্যে শামিল হবে। এই ঘোষণা ছিলো একেবারেই অযৌক্তিক। বিশেষজ্ঞদের মতে গুরুদাসপুর জিলাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য ছিলো ভারতের জন্য কাশ্মীরে পৌঁছার পথ সুগম করা।

"অগাস্ট পর্যন্ত গোটা পাঞ্জাব এক জাহান্নামের রূপ ধারণ করে। চারদিকে শুধু হত্যা, লুটতরাজ ও অগ্নি-সংযোগ এই অঞ্চলে মানুষের নয়, পশুর রাজত্ব কায়েম করে।"

দ্রষ্টব্য ঃ জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস, আব্বাস আলী খান, পৃষ্ঠা-১৯৪

জামালপুরের দারুল ইসলামে তখন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীসহ পঁচিশজন পুরুষ অবস্থান করছিলেন। আর ছিলেন কিছু সংখ্যক মহিলা। জামালপুরের চারদিকের গ্রামগুলোতে শিখেরা ছিলো সংখ্যাগুরু। হিন্দুদের মতো তারাও ছিলো মুসলিমদের প্রতি মারমুখো। ঐ সব গ্রামের মুসলিমদেরকে ব্যাপক হারে হত্যা করা হয়। ২২শে অগাস্টে এসে পাঠান কোট শহরও মুসলিমশূন্য হয়ে যায়। যেই সব মুসলিম প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলো তারা ছুটে আসতে থাকে জামালপুরে। কয়েক দিনের মধ্যেই প্রায় আড়াই হাজার লোক এসে জড়ো হয়।

জামায়াতে ইসলামীর পঁচিশজন পুরুষ এই বিপুল সংখ্যক বিপন্ন মানুষের খিদমাতে আত্মনিয়োগ করেন। তাদের মাথা গুঁজবার ব্যবস্থা করা হয়। খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়।

আশংকা ছিলো, যেই কোন মুহূর্তে জামালপুর আক্রান্ত হবে। জামায়াতে ইসলামীর সদস্যগণ ক্যাম্পের চারদিকে ট্রেঞ্চ (পরিখা) খনন করে স্থানে স্থানে পাহারার ব্যবস্থা করেন। তিনটি বন্দুক আর কিছু সংখ্যক লাঠি ছিলো তাঁদের সম্বল। সাইয়েদ আবুল আ'লার নির্দেশ ছিলো নিজেরা জীবিত থাকা অবস্থায় কোন হামলাকারীকে দারুল ইসলামে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না।

একাংশে অবস্থান করছিলো মহিলারা। তাদেরকে দা-ছুরি ইত্যাদি নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়। ২৪শে অগাস্ট মহিলাদেরকে একত্রিত করে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী একটি ভাষণ দেন। সেই ভাষণে তিনি বলেন, "হয়তো দারুল ইসলামবাসীদের আজ জীবনের শেষ দিন। এই অবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের একজন পুরুষ বেঁচে থাকবে ইনশাআল্লাহ্ দুশমন তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না। আল্লাহ না করুন, পুরুষরা যদি খতম হয়েই যায় তোমাদেরকে মুমিন নারীর মতোই লড়াই করে যেতে হবে। আত্মহত্যা করা চলবে না। জীবিত অবস্থায় কারো কাছে আত্মসমর্পণ করা চলবেনা। হামলাকারীর মুকাবিলা করবে এবং আপন ইযযতের জন্য লড়াই করে জান দেবে।"

দ্রষ্টব্য ঃ জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস, আব্বাস আলী খান, পৃষ্ঠা- ১৯৬

জামালপুরের আশ্রয় শিবিরে আটকে পড়া এই আড়াই হাজার বিপন্ন মানুষের মুক্তির পথ করে দেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

১৯৪৭ সনের ২৫শে অগাস্ট সেনাবাহিনীর একটি কনভয় এসে পৌছে জামালপুর। দুইটি ট্রাকে করে শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলাদেরকে পাঠিয়ে দেয়া হয় লাহোর। ২৯শে অগাস্ট সেনাবাহিনী জামালপুর আশ্রয় শিবিরের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ক্যাম্প রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থেকে জামায়াতে ইসলামী মুক্ত হয়। ঐ দিনই আরেকটি সামরিক কনভয়ের সাথে তিনটি বাস নিয়ে জামায়াতে ইসলামীর সদস্য আবদুল জাব্বার গাজী জামালপুর পৌছেন। ৩০শে অগাস্ট সকালে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ও তাঁর সহকর্মীগণ লাহোরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ক্যাম্পে অবস্থানরত ব্যক্তিদের মনোবল সমুন্নত রাখা ও জামায়াতে ইসলামীর রেখে যাওয়া সম্পদ দেখাশুনা করার জন্য ইহসানুল হক, আযম হাশেমী ও মুহাম্মাদ হামেদকে রেখে যাওয়া হয় জামালপুরে।

১৯৪৭ সনের ৩০শে অগাস্ট সন্ধ্যার দিকে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর সাথীদের নিয়ে লাহোর পৌঁছেন। তাঁদের থাকার জন্য সরকার একটি বাড়ি বরাদ্দ করে। কিন্তু ২৪ ঘন্টার পর তা ফেরত নেয়। মুহাজির সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ও তাঁর সাথীরা লাহোরের ইসলামীয়া পার্কে ছোট ছোট তাঁবু স্থাপন করে মাথা গুঁজলেন।

৩২. নতুন কেন্দ্রীয় কার্যালয়

লাহোর শহরের ইছরা মহল্লার ৫-এ যাইলদার পার্কের বাড়িটি ভাড়া করে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ইসলামীয়া পার্কের তাঁবু থেকে সেখানে স্থানান্তরিত হন। তখন থেকে এই বাড়িটি তারজুমানুল কুরআনের কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। আবার জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ও স্থাপিত হয় এই বাড়িতেই।

৩৩. জামায়াতে ইসলামীর বিভক্তি

উপ-মহাদেশের আযাদী হাছিলের সময় জামায়াতে ইসলামীর রুকন ছিলেন ৬২৫ জন। দেশ ভাগ হওয়ায় জামায়াতে ইসলামীকে জামায়াতে ইসলামী হিন্দ ও জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান নামে দুইটি স্বতন্ত্র সংগঠনে বিভক্ত করা হয়। দুইশত চল্লিশ জন রুকন নিয়ে জামায়াতে ইসলামী হিন্দ ও তিনশত পঁচাশি জন রুকন নিয়ে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান কাজ শুরু করে।

৩৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর রেডিও ভাষণ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে ইতিমধ্যেই সর্বমহলে পরিচিত হয়ে উঠেন। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান-গর্ভ ভাষণ দেয়ার জন্য রেডিও পাকিস্তান লাহোর তাঁকে আমন্ত্রণ জানায়। এই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তিনি ১৯৪৮ সনের ৬ই জানুয়ারী "ইসলামের নৈতিক বিধান" ২০শে জানুয়ারী "ইসলামের রাজনৈতিক বিধান", ১০ই ফেব্রুয়ারী "ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা", ২রা মার্চ "ইসলামের অর্থ ব্যবস্থা" ও ১৬ই মার্চ "ইসলামের আধ্যাত্মিক বিধান" সম্পর্কে মূল্যবান ভাষণ পেশ করেন।

৩৫. ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন

১৯৪৮ সনের জানুয়ারী মাসে "ল কলেজ, লাহোর" তাঁকে "ইসলামী আইন" সম্পর্কে বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানায়। জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা সমবেত হয়েছিলেন ঐ আলোচনা সভায়। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী প্রাঞ্জল ভাষায় ইসলামী আইনের বিভিন্ন দিক ও এইগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেন তাঁর ভাষণে। তিনি এই

কথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ একদিকে আল্লাহর কাছে, অন্য দিকে মানুষের কাছে এই ওয়াদা করেছেন যে তাঁরা পাকিস্তানে ইসলামী বিধি বিধান প্রবর্তন করবেন। এখন যদি ইসলামের পরিবর্তে পাশ্চাত্য জগতের আইন প্রবর্তন করার চেষ্টা চালানো হয় তাহলে তো মুসলিমদের জন্য আলাদা আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতাই থাকে না।

১৯৪৮ সনের ১৯শে ফেব্রুয়ারি সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী "ল কলেজ, লাহের" কর্তৃক আয়োজিত আরেকটি আলোচনা সভায় ভাষণ দেন। এবার তিনি "ইসলামী আইন প্রবর্তনের উপায়" সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। ভাষণে তিনি বলেন যে ইসলামী আইন রাতারাতি প্রবর্তন করা যাবে না। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তা কার্যকর করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে ইসলামী আইন প্রবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে পাকিস্তানের গণ-পরিষদকে ঘোষণা করতে হবে ঃ

১. "সার্বভৌমত্ব আল্লাহর। আর পাকিস্তান সরকার আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দেশ শাসন করবে।
২. ইসলামী শারীয়াহ হবে দেশের মৌলিক আইন।
৩. ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক আইনগুলোকে পরিবর্তিত করে ইসলামের সাথে সংগতিশীল আইনে পরিণত করতে হবে।
৪. ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে রাষ্ট্র কোন অবস্থাতেই শারীয়াহর সীমা লংঘন করতে পারবে না।"

দ্রষ্টব্য ঃ মাওলানা মওদূদী এন্ড হিজ থট, প্রফেসার মাসুদুল হাসান, পৃষ্ঠা- ৩৪৫

১৯৪৮ সনের মার্চ মাসে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে করাচীর জাহাংগীর পার্কে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। এই জনসভায় তিনি উপরোক্ত চার দফা দাবি উথাপন করেন এবং চারদফা ভিত্তিক "আদর্শ প্রস্তাব" গ্রহণের জন্য গণ-পরিষদের প্রতি আহ্বান জানান। এইভাবে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সূচনা করে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী দেশের বিভিন্ন স্থানে সফর করে জনসভায় ভাষণ দিতে থাকেন। অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে জনমত গড়ে উঠে। কিন্তু বিব্রতবোধ করতে থাকেন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর সেকুলার অংশটি।

৩৬. প্রথম গ্রেফতারী

১৯৪৮ সনের ১১ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের স্থপতি ও প্রথম গভর্ণর জেনারেল মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ ইন্তিকাল করেন। খাজা নাজিমুদ্দিন হন পাকিস্তানের দ্বিতীয় গভর্ণর জেনারেল। প্রধানমন্ত্রী পদে বহাল থাকেন লিয়াকত আলী খান।

১৯৪৮ সনের ৪ঠা অক্টোবর অর্থাৎ মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর ইন্তিকালের ২২ দিন পর জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, মিয়া তুফাইল মুহাম্মাদ প্রমুখ।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে লায়ালপুর জেলে রাখা হয়। অতপর তাঁকে মুলতান জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। অন্যান্য জেলখানা থেকে মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, মিয়া তুফাইল মুহাম্মাদ ও আরো কয়েকজন সহকর্মী বন্দীকেও মুলতান জেলে আনা হয়। তাঁরা সালাতুল ফাজর আদায় করার পর জেলের ভেতরে খোলা জায়গায় ভ্রমণ করতেন। সকালের নাশতা খেয়ে তাঁরা আল কুরআন অধ্যয়ন করতেন। এরপর খবরের কাগজ ও অন্য বই পড়তেন। সালাতুজ জুহরের পর আবার একত্রিত হতেন ও বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করতেন। বিকেলে তাঁরা আবার বেরুতেন হাঁটার জন্য। রাতের খাবার খেয়ে সালাতুল ইশা আদায় করে ঘুমুতে যেতেন। মোটামুটি এই ছিলো জেলখানায় তাঁদের কাজের রুটিন।

শীর্ষ স্থানীয় নেতারা জেলে থাকলেও জামায়াতে ইসলামীর জনশক্তি ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে জনমত গঠনের প্রয়াস চালাতে থাকে। অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে এগিয়ে আসে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম। জনমত এতোখানি প্রবল হয়ে উঠে যে তা উপেক্ষা করা সরকারের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।

১৯৪৯ সনের ৯ই মার্চ গণ-পরিষদ প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের নেতৃত্বে "আদর্শ প্রস্তাব" (Objective Resolution) পাস করে। "আদর্শ প্রস্তাব" পাস করায় জামায়াতে ইসলামীর মাজলিসে শূরা সরকারকে মুবারকবাদ জানায়। এই দিকে সরকার একের পর এক ডিটেনশান অর্ডার দিয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ও তাঁর সাথীদের জেলবাস দীর্ঘায়িত করতে থাকে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর ডিটেনশান চ্যালেঞ্জ করে কোন পিটিশান পেশ করেননি। তিনি বলেন যে তিনি তাঁর বিষয়টি আল্লাহর নিকট সুফর্দ করে দিয়েছেন। এইদিকে অন্য এক মামলা নিষ্পত্তি করতে গিয়ে ফেডারেল কোর্ট রায় দেয় যে জননিরাপত্তা আইনে ডিটেনশান মাত্র দুইবার বর্ধিত করা যায়, দুইবারের বেশি বর্ধিত করা যায় না। ঐ রায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিলো বিধায় সরকার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে ও তাঁর সাথীদেরকে মুক্তি দেয়। ১৯৫০ সনের ২৮শে মে প্রায় বিশ মাস কারাবাসের পর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ও তাঁর সাথীরা মুক্তি লাভ করেন।

১৯৫০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান শাসনতন্ত্রের মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট গণপরিষদে উত্থাপন করেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই রিপোর্ট ছিলো

ইতিপূর্বে গৃহীত "আদর্শ প্রস্তাবের" সাথে সামঞ্জস্যহীন। এতে ছিলো ইসলামের পরিবর্তে পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন।

১৯৫০ সনের ১৪ই অক্টোবর লাহোরে অনুষ্ঠিত জনসভায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এই রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা করেন। জামায়াতে ইসলামী দেশের বিভিন্ন স্থানে জনসভা করতে থাকে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এইসব জনসভায় বক্তব্য রেখে মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে থাকেন। দেশের অন্যান্য ইসলামী ব্যক্তিত্বও এই সময় সোচ্চার হন। সমালোচনার মুখে সরকার মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট প্রত্যাহার করে নেয়। এই সময় প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন যে দেশের আলিম সমাজ যদি সর্বসম্মতভাবে কোন শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব উপস্থাপন করতে পারে তবে গণ-পরিষদ তা বিবেচনা করে দেখবে।

৩৭. ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি প্রণয়ন

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর উদ্যোগে ১৯৫১ সনের ২১শে জানুয়ারী করাচীতে অনুষ্ঠিত হয় দেশের সেরা আলিমদের একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর তৈরি হয় মূল্যবান একটি দলীল- "ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি"। মূলনীতিগুলো ছিলো নিম্নরূপ ঃ

১. দেশের সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ।
২. দেশের আইন আল-কুরআন ও আস্‌সুন্নাহর ভিত্তিতে রচিত হবে।
৩. রাষ্ট্র ইসলামী আদর্শ ও নীতিমালার ওপর সংস্থাপিত হবে।
৪. রাষ্ট্র মারূফ প্রতিষ্ঠা করবে ও মুনকার উচ্ছেদ করবে।
৫. রাষ্ট্র মুসলিম দেশগুলোর সাথে ভ্রাতৃত্ব ঐক্য-সম্পর্ক মজবুত করবে।
৬. রাষ্ট্রকে দেশের সকল নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের গ্যারান্টি দিতে হবে।
৭. শারীয়াহর নিরিখে নাগরিকদের সকল অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
৮. আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কাউকে শাস্তি দেয়া যাবে না।
৯. স্বীকৃত মুসলিম মাযহাবগুলো আইনের আওতায় পরিপূর্ণ দীনী স্বাধীনতা ভোগ করবে।
১০. অমুসলিম নাগরিকরা আইনের আওতায় পার্সোনাল ল ও পূর্ণধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে।
১১. রাষ্ট্র শারীয়াহ কর্তৃক নির্ধারিত অ-মুসলিমদের অধিকারগুলো নিশ্চিত করবে।
১২. রাষ্ট্র-প্রধান হবেন একজন মুসলিম পুরুষ।
১৩. রাষ্ট্র-প্রধানের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হবে।

১৪. রাষ্ট্র-প্রধানকে পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি মাজলিসে শূরা থাকবে।
১৫. রাষ্ট্র-প্রধান দেশের শাসনতন্ত্র সাসপেন্ড করতে পারবেন না।
১৬. সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে রাষ্ট্র- প্রধানকে পদচ্যুত করা যাবে।
১৭. রাষ্ট্র-প্রধান তাঁর কার্যাবলীর জন্য দায়ী থাকবেন এবং তিনি আইনের উর্ধে হবেন না।
১৮. বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে স্বাধীন হবে।
১৯. সরকারী ও প্রাইভেট সকল নাগরিক একই আইনের অধীন হবে।
২০. ইসলাম বিরোধী মতবাদের প্রচারণা নিষিদ্ধ হবে।
২১. দেশের বিভিন্ন অঞ্চল একই দেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিট বলে গণ্য হবে।
২২. আল কুরআন ও আস্সুন্নাহর পরিপন্থী শাসনতন্ত্রের যেই কোন ব্যাখ্যা বাতিল বলে গণ্য হবে।

এই মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। প্রস্তাবের খসড়া তিনিই তৈরি করেন। অন্যদের উত্থাপিত সামান্য সংশোধনীসহ সর্বসম্মতিক্রমে এই নীতিমালা গৃহীত হয়।

১৯৫১ সনের ৮ই মে করাচীর আরামবাগে অনুষ্ঠিত জনসভায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবিতে জোরালো বক্তব্য রাখেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে ভারত ও পাকিস্তান একই সময়ে স্বাধীন হলো, ভারত তার শাসনতন্ত্র তৈরি করে নিলো, কিন্তু পাকিস্তান তার শাসনতন্ত্র তৈরির কাজে এখনো একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে অবস্থান করছে। শাসনতন্ত্র প্রণয়নে বিলম্বকে তিনি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বলেও উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন যে দেশের মানুষ গণ-পরিষদের কাছে শুধু একটি শাসনতন্ত্রই চাচ্ছে না, চাচ্ছে একটি ইসলামী শাসনতন্ত্র।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামী সারা দেশে জনসভা অনুষ্ঠান, পোস্টারিং ও হ্যান্ডবিল বিলির মাধ্যমে ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে জনমত বলিষ্ঠতর করার অভিযান চালাতে থাকে।

১৯৫১ সনের ১৬ই অক্টোবর রাওয়ালপিন্ডির এক জনসভায় বক্তৃতা দান কালে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। ক্ষমতার উচ্চ কেন্দ্রে ঘটে বড়ো রকমের রদবদল। পাকিস্তানের তৃতীয় গভর্ণর জেনারেল হন ইসলাম বিদ্বেষী মালিক গোলাম মুহাম্মাদ। আর গভর্ণর জেনারেল পদ থেকে নামিয়ে খাজা নাজিমুদ্দীনকে করা হয় প্রধানমন্ত্রী।

খাজা নাজিমুদ্দীন শাসনতন্ত্র রচনার কাজে হাত দেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯৫২ সনের ২২শে ডিসেম্বর গণ-পরিষদে নতুন করে শাসনতন্ত্রের মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপিত হয়।

১৯৫৩ সনের ৩০শে জানুয়ারী লাহোরে অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর জনসভায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট প্রসংগে বলেন যে এই রিপোর্টের অনেক কিছু ভালো দিক রয়েছে। আবার কিছু মন্দ দিকও রয়েছে। তিনি আরো বলেন যে ভালো দিকগুলোকে সমর্থন করা ও মন্দ দিকগুলো পরিবর্তনের জন্য কাজ করা প্রয়োজন।।

৩৮. কাদিয়ানীদেরকে অ-মুসলিম ঘোষণার দাবিতে আন্দোলন

১৯৫৩ সনের জানুয়ারী মাসে কাদিয়ানী সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য করাচীতে একটি সর্বদলীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে যোগদান করে জামায়াতে ইসলামী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, মজলিসে আহরার, জমিয়তে আহলে হাদীস, আনজুমানে তাহাফফুজে হুকুকে শিয়া, মুসলিম লীগ প্রভৃতি।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী কাদিয়ানী সমস্যাটিকে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনে শামিল করে নেয়ার প্রস্তাব দেন।

১৯৫৩ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারী এই বিষয়ে আলোচনার জন্য করাচীতে সর্বদলীয় নির্বাহী পরিষদের মিটিং বসে। এই সভায় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য ডাইরেকট্ এ্যাকশানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জামায়াতে ইসলামী এই ধরনের কার্যক্রমে বিশ্বাসী ছিলো না বিধায় সর্বদলীয় কনভেনশনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে। করাচীতে ডাইরেক্ট এ্যাকশান ব্যর্থ হয়। পাঞ্জাবে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এই জন্য সরকারের অসহিষ্ণুতাই মূলত দায়ী ছিলো।

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মুসলিম লীগের মুমতাজ দাওলাতানা। মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের বিক্ষোভ, এটা তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। তিনি পুলিশ লেলিয়ে দেন। কাদিয়ানীরাও জীপে চড়ে এখানে ওখানে মুসলিমদের ওপর গুলি ছোঁড়ে। ফলে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারন করে।

১৯৫৩ সনের ৬ই মার্চ লাহোরে মার্শাল ল ঘোষণা করা হয়। কয়েক ঘন্টার মধ্যে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে যায়।

৩৯. দ্বিতীয় গ্রেফতারী ও মৃত্যুদন্ডাদেশ

১৯৫৩ সনের ২৮শে মার্চ মার্শাল ল কর্তৃপক্ষ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, মিয়া তুফাইল মুহাম্মাদ, মালিক নাসরুল্লাহ খান আযীয, চৌধুরী মুহাম্মাদ আকবার ও সাইয়েদ নকী আলীকে গ্রেফতার করে।

"কাদিয়ানী সমস্যা" শীর্ষক পুস্তিকার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ানো ও সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অভিযোগ এনে মিলিটারী ট্রাইবুনালে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর বিচার শুরু করা হয়। ৮ই মে ট্রাইবুনাল তাঁকে ফাঁসির হুকুম দেয়।

উল্লেখ্য যে এই দাংগায় নিহত হন ১১ জন লোক। আহত হন ৪৯ জন। এই দাংগার জন্য জামায়াতে ইসলামী বিন্দুমাত্র দায়ী ছিলো না। উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপায় সরকার।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে ফাঁসির হুকুম দেয়ায় দারুণ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে থাকে তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরা। কিন্তু সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ছিলেন একেবারেই নিরুদ্বিগ্ন। তাঁর ক্রন্দনরত ছেলেকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বলেন, "কাঁদছো কেন? জীবন ও মৃত্যুর ফায়সালা হয় আসমানে, যমীনে নয়।"

৪০. ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নে অগ্রগতি

প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন শাসনতন্ত্র প্রণয়নে হাত দেন। কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে গভর্ণর জেনারেল মালিক গোলাম মুহাম্মাদের সাথে তাঁর মত বিরোধ ঘটে। ১৯৫৩ সনের ১৭ই এপ্রিল গোলাম মুহাম্মাদ প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে খাজা নাজিমুদ্দীনকে বরখাস্ত করেন। আমেরিকা থেকে বগুড়ার মুহাম্মাদ আলীকে ডেকে এনে প্রধানমন্ত্রী বানানো হয়।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর মৃত্যু দন্ডাদেশ প্রচারিত হবার পর দেশে-বিদেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। ১২ই মে করাচীতে হরতাল পালিত হয়। প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মাদ আলী ঢাকা থেকে করাচী এয়ারপোর্টে পৌঁছে বিশাল জনতার বিক্ষোভের সম্মুখীন হন। প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি বিবেচনার ওয়াদা করেন। ১৪ই মে মার্শাল ল কর্তৃপক্ষ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর মৃত্যু দন্ড রহিত করে চৌদ্দ বছর সশ্রম কারাদন্ডের কথা ঘোষণা করে।

প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মাদ আলী ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি পাকিস্তানের স্থপতি মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর জন্মদিন ২৫শে ডিসেম্বর দেশবাসীকে একটি ইসলামী শাসনতন্ত্র উপহার দেবেন।

গভর্ণর জেনারেল গোলাম মুহাম্মাদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে ফাঁসিতে ঝুলাতে পারেন নি, সেই জন্য দারুণ মর্মজ্বালায় ভুগছিলেন। ইসলামী শাসনতন্ত্রের ঘোষণা উচ্চারিত হওয়ায় তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। ১৯৫৪ সনের

২৪শে অক্টোবর তিনি শাসনতন্ত্র তৈরির কাজে নিয়োজিত গণ-পরিষদই ভেংগে দেন।

গণ-পরিষদের স্পীকার মৌলভী তমিজুউদ্দীন খান সিনধের চীফ কোর্টে গভর্ণর জেনারেলের পদক্ষেপ চ্যালেঞ্জ করেন। কোর্ট তাঁর পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু ফেডারেল কোর্ট সরকারের পক্ষে রায় দেয়।

এমতাবস্থায় গভর্ণর জেনারেল মালিক গোলাম মুহাম্মাদ ইমার্জেন্সী পাওয়ারস অর্ডিন্যান্স জারি করে অনেক ধরনের ক্ষমতার সাথে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষমতাও নিজের হাতে তুলে নেন। কিন্তু ১৯৫৫ সনের ১৩ই এপ্রিল ভিন্ন একটি মামলার রায় প্রদান কালে ফেডারেল কোর্ট ইমার্জেন্সী পাওয়ারস অর্ডিন্যান্স বাতিল ঘোষণা করে এবং সরকারকে নতুন গণ-পরিষদ গঠন করে তার ওপর শাসনতন্ত্র রচনার ভার অর্পণ করতে বলে।

ফেডারেল কোর্টের রায়ের ফলে যেই সব আইন অকার্যকর হয়ে পড়ে তার একটির আওতায় বন্দী ছিলেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। ফলে তাঁকে আর বন্দী রাখা সম্ভব ছিলো না। দুই বছর একমাস কারাবাসের পর ১৯৫৫ সনের ২৯শে এপ্রিল সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী মুক্তি লাভ করেন।

১৯৫৫ সনের ২৫শে জুন ৮০ সদস্য বিশিষ্ট নতুন গণ-পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গভর্ণর জেনারেল মালিক গোলাম মুহাম্মাদ এবার চৌধুরী মুহাম্মাদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন।

চৌধুরী মুহাম্মাদ আলী একটি ইসলামী শাসনতন্ত্র তৈরির জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালাতে থাকেন।

১৯৫৬ সনের ২৯শে ফেব্রুয়ারি গণ-পরিষদ পাকিস্তানের জন্য একটি শাসনতন্ত্র পাস করে। ২রা মার্চ গভর্ণর জেনারেল তাতে স্বাক্ষর করেন। ২৩শে মার্চ থেকে এই শাসনতন্ত্র কার্যকর করা হবে বলে স্থির হয়। উল্লেখ্য যে ১৯৪০ সনের ২৩শে মার্চ লাহোর সম্মেলনে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গ্রহণ করেছিলো।

১৯৫৬ সনের ২৩শে মার্চ গভর্ণর জেনারেল মালিক গোলাম মুহাম্মাদকে অব্যাহতি দেয়া হয়। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী দেশের নাম হয় ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান। আর এর প্রথম প্রেসিডেন্ট হন মেজর জেনারেল ইসকান্দার আলী মির্যা। চৌধুরী মুহাম্মাদ আলী বহাল থাকেন প্রধানমন্ত্রী পদে। বহু চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে অবশেষে একটি শাসনতন্ত্র তৈরি ও প্রবর্তন করা সম্ভব হয়।

৪১. সাইয়েদ আবুল আ'লার (তদানীন্তন) পূর্ব পাকিস্তান সফর

১৯৫৫ সনের ২৯শে এপ্রিল মুলতান জেলখানা থেকে মুক্তি লাভের পর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী কোয়েটা এক্সপ্রেস ট্রেনে করে লাহোর পৌছেন। লাহোর রেলস্টেশন তখন লোকে লোকারণ্য। চার মাইল দীর্ঘ এক মিছিলের সাথে তিনি পৌছেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। এর পর তিনি সফরে বের হন। দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে তিনি ইসলামী শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট, প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করতে থাকেন।

১৯৫৬ সনের ২৬শে জানুয়ারী সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আকাশ পথে লাহোর থেকে ঢাকা পৌছেন। তেজগাঁও এয়ারপোর্টে প্রাদেশিক শীর্ষনেতা মাওলানা আবদুর রহীম ও অধ্যাপক গোলাম আযমের নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরা তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে।

২৭ শে জানুয়ারী তিনি ঢাকা পল্টন ময়দানে একটি জনসভায় বক্তৃতা করেন। ৩০শে জানুয়ারী তিনি ভাষণ দেন সিলেটের জনসভায়। ১লা ফেব্রুয়ারী তিনি বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা টাউন হলে, ২রা ফেব্রুয়ারী তিনি চট্টগ্রামের জে. এম সেন হলে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। ৬ই ফেব্রুয়ারী তিনি বক্তব্য রাখেন লালদীঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায়। ৭ই ফেব্রুয়ারী তিনি নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তৃতা করেন। ১০ই ফেব্রুয়ারী তিনি বরিশালের জনসভায় যোগ দেন। বরিশাল বি.এম. কলেজে একটি ছাত্র সমাবেশেও তিনি বক্তব্য রাখেন। টাউন হলে অনুষ্ঠিত সমাবেশেও তিনি মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন।

বরিশাল থেকে তিনি স্টীমারে করে খুলনা পৌছেন। ১১ই ফেব্রুয়ারী তিনি খুলনার জনসভায় ভাষণ দেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারী তিনি বক্তব্য পেশ করেন যশোরে অনুষ্ঠিত জনসভায়। রাতে তিনি ফরিদপুরের পথে রাজবাড়ী এসে পৌছেন। রাজবাড়ী পৌছে তিনি রেস্ট হাউসের সামনে সমবেত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন এবং রেস্ট হাউসেই রাত কাটান। ১৪ই ফেব্রুয়ারী তিনি ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণ দেন। ১৫ ফেব্রুয়ারী তিনি কুষ্টিয়া জনসভায় বক্তব্য রাখেন। অতপর তিনি রাজশাহী ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণ দেন। তিনি রাজশাহী বারে রাজশাহী বার এসোসিয়েশনের সদস্যদের উদ্দেশ্যেও বক্তব্য রাখেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী তিনি বগুড়াতে এক জনসভায় ভাষণ দেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারী তিনি বক্তব্য রাখেন গাইবান্ধা জনসমাবেশে। পরদিন তিনি ঠাকুরগাঁও সফর করেন। ১লা মার্চ তিনি ঢাকা পৌছেন। ২রা মার্চ তিনি ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড হলে অনুষ্ঠিত এক সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) ব্যাপক সফর করে ইসলামের পক্ষে আলোড়ন সৃষ্টি করে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ১৯৫৬ সনের ৪ঠা মার্চ লাহোরে ফিরেন।

৪২. সাইয়েদ আবুল আ'লার প্রথম বিদেশ সফর

১৯৫৬ সনের মধ্যভাগে সিরিয়ার রাজধানী দামেসকে অনুষ্ঠিত হয় মু'তামার আল আলম আল ইসলামীর সম্মেলন। এই সম্মেলনে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী অন্যতম মেহমান হিসেবে আমন্ত্রিত হন। ২৫শে জুন তিনি করাচী এয়ারপোর্ট থেকে আকাশপথে বৈরুত রওয়ানা হন। যথাসময়ে তিনি সেখানে পৌছেন। লেবাননের ইসলামী আন্দোলন "ইবাদুর রাহমান" ও "আল ইখওয়ানুল মুসলিমূনের" নেতৃবৃন্দ তাঁকে এয়ারপোর্টে সম্বর্ধনা জানান। সেখান থেকে মোটর গাড়িতে চড়ে তিনি সিরিয়ার রাজধানী দামেসকে পৌছেন। মু'তামারের সম্মেলনে মুসলিম উম্মাহর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে তিনি জ্ঞানগর্ভ ভাষণ পেশ করেন। তিনি মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির গুরুত্বও বিশ্লেষণ করেন। তিনি একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন যেটি দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় রচিত উন্নতমানের ইসলামী সাহিত্য অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ ও বিতরণের ব্যবস্থা করবে। তিনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মুসলিম প্রিন্ট মিডিয়া ও নিউজ এজেন্সী গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মুসলিম দেশগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তাও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

তাঁর সফর কালে তিনি দামেসক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক সমাবেশে বক্তৃতা করেন। এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেছিলেন সিরিয়ার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী। দামেসকে অবস্থানকালে তিনি মরক্কোর ইসলামী আন্দোলনের নেতা মাক্কী আন্নাসিরী এবং মিসরের আল ইখওয়ানুল মুসলিমূনের" স্থপতি শহীদ শায়খ হাসানুল বান্নার জামাতা ডঃ সায়ীদ রমাদানের সাথে সাক্ষাত ও মত বিনিময় করেন।

জর্ডনের কিং হুসাইন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ও মু'তামারের সম্মেলনে যোগদানকারী অন্যান্য প্রতিনিধিকে জর্ডন সফরের আমন্ত্রণ জানান। যথা সময়ে তাঁরা জর্ডন পৌছেন। সাইয়েদ আবুল আ'লা রাজধানী আম্মানে এক বিশাল জনসমাবেশে ভাষণ দেন। তিনি ইবরাহীম (আ) এর কর্মকেন্দ্র ও সমাধিস্থল আল খালীল বা হেবরনও দর্শন করেন। (তখন আল খালীল জর্ডনের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। বর্তমানে এটি ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের দখলে রয়েছে)। অতপর তিনি হালব শহর দেখতে যান। পরে দামেসক পৌছেন।

১৯৫৬ সনের ১১ই জুলাই সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আকাশ পথে সাউদী আরবের জিদ্দা পৌছেন। জিদ্দা থেকে মাক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তখন ছিলো হাজ মওসুম। সাইয়েদ আবুল আ'লা হাজ পালন করেন। মাক্কাতে তিনি আঠার দিন অবস্থান করেন। এই সময় তিনি ইসলামের ঐতিহাসিক স্থানগুলো দেখার সুযোগ পান। মাক্কা থেকে তিনি পৌছেন মাদীনা। তিনি মাসজিদে নববীতে সালাত আদায় করেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) কবরের সন্নিকটে দাঁড়িয়ে প্রিয় নবীর উদ্দেশ্যে সালাত ও সালাম পেশ করেন। তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন স্থান দেখেন।

১৯৫৬ সনের অগাষ্ট মাসের মাঝামাঝি সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর প্রথম বিদেশ সফর সমাপ্ত করে লাহোর ফিরেন।

৪৩. ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্রের দুই দিক

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী দেশের জন্য একটি শাসনতন্ত্র তৈরি হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। শাসনতন্ত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি থাকাটাকে তিনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গণ্য করেন। শাসনতন্ত্রে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করার বিধান রাখা হয়েছিলো এবং জনগণের মৌলিক অধিকার হিফাজাতের দায়িত্ব বিচার বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিলো। এটিকেও তিনি বড়ো রকমের সাফল্য হিসেবে দেখেন।

তবে এই কথাও সত্য যে ইসলামী মুলনীতিগুলোকে জাতীয় জীবনে কিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে তার দিক নির্দেশনা শাসনতন্ত্রে ছিলো না। তদুপরি "যুক্ত নির্বাচন" না "পৃথক নির্বাচন"- এই বিষয়টিও অমীমাংসিত রাখা হয়েছিলো।

৪৪. ক্ষমতার দ্বন্দ্ব

এই শাসনতন্ত্র না ছিলো পুরোপুরি প্রেসিডেনশ্যাল" না ছিলো পুরোপুরি "পার্লামেন্টারী"। ফলে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না থাকলে ক্ষমতা নিয়ে টাগ-অব-ওয়ারের সুযোগ ছিলো। এই সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করেছিলেন "ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানের" প্রথম প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার আলী মীর্যা।

ব্যক্তিগতভাবে তিনি কোন ইসলামী ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। ইসলামের প্রতি তাঁর অনুরাগও ছিলো না। পক্ষান্তরে প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মুহাম্মাদ আলী ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম। এসেম্বলীতে মুসলিম লীগের নেতা হিসেবে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করছিলেন। তাঁর সাথে বনিবনা না হওয়ায় প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার আলী মীর্যা, মালিক ফিরোজ খান নুনকে দিয়ে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে রিপাবলিকান পার্টিকে

শক্তিশালী করে তোলেন। একে একে বহু লোক মুসলিম লীগ ছেড়ে রিপাবলিকান পার্টিতে যোগ দিতে থাকে।

চৌধুরী মুহাম্মাদ আলীর জন্য অবস্থা নাজুক হয়ে উঠে। বিরক্ত হয়ে তিনি ১৯৫৬ সনের ৮ই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেন।

১৯৫৬ সনের ১২ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ ও রিপাবলিকান পার্টির কোয়ালিশান সরকার কায়েম হয়। প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন আওয়ামী লীগের হুসাইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কিছুদিন পরেই প্রধানমন্ত্রী হুসাইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী লাহোরের এক জনসভায় "যুক্ত নির্বাচন" পদ্ধতির পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। ঐ বছরের অকটোবর মাসে করাচীতে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী "পৃথক নির্বাচন" পদ্ধতির পক্ষে বক্তব্য রাখেন। ঐ জনসভায় এক লাখের বেশি শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

৪৫. জামায়াতে ইসলামীতে মতবিরোধ

গণ-পরিষদে "আদর্শ প্রস্তাব" পাস হওয়ার পর ১৯৫১ সনের ১০ই নভেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত হয় জামায়াতে ইসলামীর রুকন সম্মেলন। এই সম্মেলনে গৃহীত একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিলো এই যে অতপর জামায়াতে ইসলামী দেশের সাধারণ নির্বাচনগুলোতে অংশ নেবে।

এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে জামায়াতে ইসলামী পাঞ্জাব প্রদেশ, সীমান্ত প্রদেশ ও বাহাওয়ালপুর রাজ্যের কয়েকটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। পাঞ্জাব প্রদেশে একজন ও বাহাওয়ালপুরে দুইজন নমিনি নির্বাচিত হন। অধিকাংশ নমিনি নির্বাচনে ফেল করায় কেন্দ্রীয় মাজলিসে শূরার কয়েকজন সদস্য বলেন যে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা ভুল হয়েছে এবং ব্যাপক হারে লোক তৈরি না হওয়া পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

এই মত-বিরোধ নিরসনের জন্যই ১৯৫৭ সনের ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ও ২১শে ফেব্রুয়ারী বাহাওয়ালপুর রাজ্যের রহীম ইয়ার খান জিলার মাছিগোঠ পল্লীতে অনুষ্ঠিত হয় জামায়াতে ইসলামীর রুকন সম্মেলন। এই সময় রুকন ছিলেন ১২৭২ জন। নয় শত পঁয়তাল্লিশজন রুকন সম্মেলনে যোগদান করেন।

নির্বাচন অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার জন্য যাঁরা বক্তৃতা করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী ও আবদুল জাব্বার গাজী। বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করে তাঁরা ছয় ঘন্টা বক্তব্য রাখেন। তাঁদের যুক্তি খন্ডন করে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীও ছয় ঘন্টাব্যাপী ভাষণ পেশ করেন।

এই ভাষণে তিনি বলেন,

"সমাজকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার জন্য তৈরি করাই যদি আপনাদের সমাজ সংশোধনের উদ্দেশ্য হয় তাহলে ভোটারদেরকে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তৈরি করার কাজটি সেই প্রচেষ্টার কর্ম সীমার বাইরের বিষয় হয় কিভাবে? আর এই কাজটি না করলে সমাজ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী নেতৃত্বকে অপসারিত করে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার যোগ্য হবে- এটাই বা কি করে সম্ভব? ইসলামী জীবন বিধানের সাথে তাদেরকে পরিচিত করে তুলতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার আকাংখা তাদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে। সৎ ও অসৎ নেতৃত্বের পার্থক্য তাদেরকে বুঝাতে হবে। দেশের ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণের দায়িত্ব যে তাদের ওপর ন্যস্ত, এই চেতনা তাদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে। তারা যাতে অর্থের বিনিময়ে ভোট বিক্রি না করে, কারো হুমকিতে বিবেকের বিরুদ্ধে গিয়ে কাউকে ভোট না দেয়, কোন ধোঁকাবাজের দ্বারা প্রতারিত না হয়, অথবা দুর্নীতি দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ঘরে বসে না থাকে– অন্তত অতোটুকু নৈতিক শক্তি ও বিচারবুদ্ধি তাদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এই কাজটুকু আমরা করতে চাই। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি ভাবতে পারেন যে এটা সমাজ সংশোধনের কাজ নয়? কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি ভাবতে পারেন যে দেশের ভোটারদেরকে এইভাবে তৈরি না করেই নেতৃত্বের পরিবর্তন সাধিত হতে পারে ?"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা- ১২৩, ১২৪।

এই ভাষণের একাংশে তিনি বলেন,

"লোকদের ঈমানদার, নামাযী, পরহেযগার ও সংশোধনকামী হওয়া এক কথা, আর ফায়সালার সময় বিদ্বেষ, প্রলোভন, ভয়–ভীতি ও প্রতারণা থেকে মুক্ত হয়ে কার্যত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পাল্লাকে ভারি করার জন্য দৃঢ় সংকল্প হওয়া ভিন্ন কথা। প্রথম ধরনের সংশোধনের কাজ যতো খুশি যতো বেশি করতে চান তো করতে থাকুন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কতো লোক এই চূড়ান্ত পর্যায়ের সংশোধনকে কবুল করেছে, তা শুধু ফায়সালার সময়েই জানা যেতে পারে। আর সেই ফায়সালার সময় আসে নির্বাচনের মওসুমে। এই মানদন্ডই কয়েক বছর অন্তর সমাজের মনোভংগি ও নৈতিকতার প্রকৃত অবস্থা এবং তার ভালো-মন্দের প্রতিটি দিক মেপে জুকে দেখিয়ে দেয়। এ এক ধরনের আদম শুমারী। সমাজে কয়জন ভোট বিক্রয়কারী রয়েছে, কয়জন চাপের কাছে নতি স্বীকার করে, কয়জন বিদ্বেষে লিপ্ত, কয়জন ইসলাম-বিরোধী মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত, কি পরিমাণ দুর্নীতি এখানে প্রচলিত এবং তাদের মধ্যে কয়জন ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সহায়তার জন্য তৈরি হয়েছে– এর

প্রতিটি বিষয়ই এই আদম শুমারী হিসাব করে বলে দেয়। এই মানদন্ডের সম্মুখীন না হয়ে সমাজ সংশোধনের জন্য আপনাদের মেহনতের ফলে প্রকৃতপক্ষে কতোটুকু সংশোধনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, আর কতোটুকুই বা বাকি আছে- তা জানা যাবে আর কোন উপায়ে?"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা- ১২৫

তিনি আরো বলেন,

"আমি স্বীকার করি যে বর্তমান পরিস্থিতিতে সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই কম। এও স্বীকার করি যে ব্যর্থতার ফলে জনমনেও খারাপ প্রভাব পড়ে, আন্দোলনের সমর্থকরাও নিরুৎসাহিত হয় এবং আমাদের কর্মীদের মধ্যেও কিছুটা বীতশ্রদ্ধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও নির্বাচন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার জন্য এটাকে সঠিক ও যুক্তিসংগত কারণ বলে আমি স্বীকার করিনা। ব্যর্থতার যেই কারণগুলো দেখানো হয়, নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করে তার একটিও দূর করা যাবে না। নির্বাচন থেকে দূরে সরে থাকলে এই কারণগুলো হ্রাস পাওয়া তো দূরে থাক বরং আরো বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এইগুলোর প্রতিকারের একমাত্র উপায় হচ্ছে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতরণ করে এইগুলোর মুকাবিলা করতে থাকা ও এইগুলোর শিকড় উপড়ে ফেলা।"

দ্রষ্টব্যঃ ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা- ১৩২, ১৩৩

আরো এগিয়ে তিনি বলেন,

"রাজনৈতিক দলগুলো যেইসব নির্বাচনী অস্ত্র ব্যবহার করে ও শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা যেইগুলো ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা, নির্ভীকতা ও বেপরোয়া ভাব দেখায় তা আপনা-আপনি পরিত্যক্ত হবে বলে কি আপনারা মনে করেন? আপনারা কি মনে করেন যে এই লোকগুলো আপনা-আপনি সাধু-সজ্জন হয়ে যাবে ও এইসব অস্ত্র ব্যবহার করতে লজ্জা পাবে? নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ক্ষমতার পরিবর্তনের জন্য আপনারা কি এমন একটি মুহূর্তের প্রত্যাশী যখন দুষ্কৃতিকারীরা ময়দান থেকে আপনা আপনি সরে দাঁড়াবে, আর কেবল ভদ্র লোকদের সাথেই আপনাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে? এই যদি আপনাদের আকাংখা হয় এবং এই শর্তগুলো পূর্ণ হলেই যদি আপনারা নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্য কাজ করতে চান, তবে আপনাদের এই আকাংখা ও শর্তগুলো কবে পূর্ণ হবে এবং কবে আপনারা এই সৎ কাজের জন্য অগ্রসর হতে পারবেন, তা আমি জানিনা। নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্য আপনারা যদি

সত্যিই কিছু করতে চান তো এই "নোংরা খেলায়" পবিত্রতার সাথে এগিয়ে আসুন, বৈধ পন্থায় তামাম অবৈধ অস্ত্রের মুকাবিলা করুন, জাল ভোটের মুকাবিলায় নির্ভেজাল ভোট দিন, অর্থের বিনিময়ে ভোট ক্রয়কারীদের মুকাবিলায় নীতি ও আদর্শের খাতিরে ভোট দাতাদের নিয়ে আসুন এবং ধোঁকা প্রতারণা ও মিথ্যার দ্বারা কাজ হাছিলকারীদের মুকাবিলায় ইস্পাত কঠিন ঈমানের পরিচয় দিন। এর ফলে একবার নয়, দশবার পরাজয় বরণ করতে হলেও করুন। আপনারা পরিবর্তন আনতে চাইলে একমাত্র এইভাবেই আনতে পারেন। এইভাবে কাজ করতে করতে এমন এক সময় আসবে যখন সমস্ত অবৈধ অস্ত্র প্রয়োগ করেও দুষ্কৃতিকারীরা পরাজিত হবে।"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা- ১৩৩

এই ভাষণে তিনি আরো বলেন,

"সন্দেহ নেই, এ একটি দুর্গম পথ। এতে হোঁচট খেতে হবে, পরাজয় বরণ করতে হবে, দুর্বলচিত্ত লোকেরা নিরুৎসাহিত হবে। আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যদের মনেও হতাশা সৃষ্টি হবে। আর এই কথাও সত্য যে জনগণের একটি বিরাট অংশ এই প্রাথমিক পরাজয় থেকে ভুল অর্থ গ্রহণ করবে। কিন্তু এই দুর্গম পথ ছাড়া আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার বিকল্প কোন পথ নেই।"

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা- ১৩৪

উল্লেখ্য যে, এই ভাষণে একটি মৌলিক বিষয়ের দিকেও তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, "একটি নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বসবাস করে নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্য কোন অনিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করা শারীয়াহ সমর্থিত নয়।"

দ্রষ্টব্যঃ ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী- পৃষ্ঠা- ১২০

অতপর সম্মেলনে উপস্থিত রুকনদের মতামত গ্রহণ করা হয়। নয়শত পঁয়তাল্লিশ জন রুকনের মধ্যে নয়শত বিশ জন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর মত সমর্থন করেন। ভিন্নমত সমর্থন করেন মাত্র পনর জন রুকন।

৪৬. দেশের নির্বাচন পদ্ধতি প্রশ্নে গণ-ভোট দাবি

প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার আলী মীর্যার সাথে মত বিরোধ সৃষ্টি হওয়ায় ১৯৫৭ সনের ১৬ই অকটোবর হুসাইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেন।

এবার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন মুসলিম লীগের আই.আই. চুন্দ্রিগড়। নতুন প্রধানমন্ত্রী "পৃথক নির্বাচন" পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য একটি বিলের খসড়া তৈরি করে ফেলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ "পৃথক নির্বাচন" পদ্ধতি প্রতিরোধ করতে ছিলো দৃঢ় সংকল্প। আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে রিপাবলিকান পার্টিকে মন্ত্রীসভা গঠনে সাহায্য করতে এই শর্তে প্রস্তুত হয় যে রিপাবলিকান পার্টি "পৃথক নির্বাচন" নয় "যুক্ত নির্বাচন" পদ্ধতি প্রবর্তন করবে। ক্ষমতার মোহে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মনোভংগি উপেক্ষা করে রিপাবলিকান পার্টি আওয়ামী লীগের প্রস্তাব মেনে নেয়। ১৯৫৭ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মালিক ফিরোজ খান নূন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

প্রধানমন্ত্রী হয়ে মালিক ফিরোজ খান নূন "যুক্ত নির্বাচন" পদ্ধতি সংক্রান্ত বিল তৈরির কাজে হাত দেন। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মত উপেক্ষা করে "যুক্ত নির্বাচন" সংক্রান্ত বিল তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রিপাবলিকান পার্টি ও আওয়ামী লীগের তীব্র সমালোচনা করেন।

১৯৫৮ সনের ১৯শে জানুয়ারী লাহোরের মুচিগেটে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী নির্বাচন পদ্ধতি বিষয়ে সারা দেশে গণভোট (রেফারেন্ডাম) অনুষ্ঠানের দাবি জানান।

৪৭. সাইয়েদ আবুল আ'লার তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে দ্বিতীয় সফর

১৯৫৮ সনের ৩০শে জানুয়ারী সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী করাচী থেকে আকাশ পথে ঢাকা পৌছেন। ৩১শে জানুয়ারী তাঁকে ঢাকাতে সম্বর্ধনা দেয়া হয়। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি "যুক্ত নির্বাচন" পদ্ধতির ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

অতপর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী চট্টগ্রাম সফর করেন। এখানে তিনি সুধী সমাবেশ, বার এসোসিয়েশান সদস্যদের সমাবেশ ও জনসভায় বক্তব্য রাখেন।

সেখান থেকে কুমিল্লা পৌঁছেন। কুমিল্লায় তিনি সুধী সমাবেশে ও জনসভায় বক্তব্য রাখেন।

৮ই ফেব্রুয়ারী তিনি সিলেটে এক জনসভায় ভাষণ দেন। ১১ই ফেব্রুয়ারী তিনি বক্তৃতা করেন রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত জনসভায়।

১৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি মোমেনশাহীতে একটি সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

২২ ফেব্রুয়ারী তিনি ট্রেনযোগে রংপুর পৌছেন। স্টেশনে পৌছলে তাঁকে জানানো হয় যে জিলা ম্যাজিস্ট্রেট শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেছেন। শহরে জামায়াতে ইসলামী কোন জনসভা করতে পারবে না। উল্লেখ্য যে তখন তদানীন্তন পূর্ব

পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ সরকার কায়েম ছিল। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী স্টেশনে সমবেত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখে ঐ ট্রেনে করেই সৈয়দপুর পৌঁছেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারী তিনি সৈয়দপুর জনসভায় ভাষণ দেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারী তিনি ভাষণ দেন দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়। ২৮শে ফেব্রুয়ারী ঠাকুরগাঁওতে অনুষ্ঠিত জনসভায় তিনি বক্তব্য রাখেন।

এবার তিনি একটানা ৪৫ দিন সফর করেন। ১৯৫৮ সনের ১৫ই মার্চ ঢাকাতে তিনি একটি প্রেস বিবৃতি দেন। এতে তিনি বলেন যে ৮০ থেকে ৯০ ভাগ লোক "পৃথক নির্বাচন" পদ্ধতির পক্ষে। রিপাবলিকান পার্টি ও আওয়ামীলীগ বলে বেড়াচ্ছে যে দেশের বেশির ভাগ লোক "যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতির পক্ষে। তিনি প্রশ্ন করেন, তাদের দাবি যদি সত্য হয় তাহলে তারা গণভোট (রেফারেন্ডাম) দিতে ভয় পাচ্ছে কেন?

সফর শেষে তিনি লাহোর ফিরেন।

৪৮. অ-শাসনতান্ত্রিক শাসনের কবলে পাকিস্তান

১৯৫৪ সনের ৮ থেকে ১২ই মার্চ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক পরিষদের আসন সংখ্যা ছিলো তিনশত নয়।

এই নির্বাচনে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও হুসাইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক পরিচালিত যুক্তফ্রন্ট তিন শত আসনে বিজয়ী হয়। মুসলিম লীগ পায় মাত্র নয়টি আসন।

১৯৫৪ সনের ৩রা এপ্রিল শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। আওয়ামী লীগ এই মন্ত্রীসভায় যোগদানে বিরত থাকে। যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন দলগুলো পারস্পরিক কোন্দলে লিপ্ত হয়। এক মাস সাতাশ দিন পর ১৯৫৪ সনের ৩০শে মে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেংগে দিয়ে প্রদেশে গভর্ণরের শাসন কায়েম করে।

১৯৫৬ সনের ৬ই জুন গভর্ণরের শাসন প্রত্যাহার করা হয় এবং আবু হুসাইন সরকারের নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করা হয়। এবারও আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভায় যোগদানে বিরত থাকে। মাত্র দুই মাস পর আওয়ামী লীগ আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের ফলে আবু হুসাইন সরকার মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। ১৯৫৬ সনের ৬ই সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। প্রায় দুই বছর এই সরকার ক্ষমতায় ছিলো।

১৯৫৮ সনের ৩০ মার্চ তদানীন্তন গর্ভণর শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক আতাউর রহমান খানের মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করায় আবু হুসাইন সরকারের নেতৃত্বে আবার মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এই দিকে এ.কে. ফজলুল হক গভর্ণর পদ হারান।

নতুন গভর্ণর হয়ে আসেন সুলতানউদ্দীন আহমদ। তিনি আবু হুসাইন সরকারকে বরখাস্ত করে আবার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করেন আতাউর রহমান খানকে।

১৯৫৮ সনের ২০শে সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খান মন্ত্রীসভার প্রতি আস্থা ভোটের জন্য প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন ডাকা হয়। এই অধিবেশন স্পীকার আবদুল হামিদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে। ফলে ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী পাটোয়ারী স্পীকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু সংসদ সদস্যরা এক পর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে স্পীকারের ওপর হামলা চালায়। হাসপাতালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

এই সময় তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানে খান আবদুল কাইয়ুম খানের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মারমুখো হয়ে উঠে। আবার কালাত দেশীয় রাজ্যের খান তার রাজ্যটিকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করে নেয়ার চেষ্টা চালাতে থাকেন।

১৯৫৮ সনের ৬ই অক্টোবর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লাহোরের মুচিগেটে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণ দেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে দেশ এমন এক নাজুক অবস্থায় পৌছেছে যে কেউ বলতে পারে না আগামী কাল কি ঘটবে, এমন হতে পারে যে লোকেরা রাতে ঘুমিয়ে পড়বে, আর সকালে উঠে জানতে পাবে যে পুরো শাসনতন্ত্রই বাতিল হয়ে গেছে।

বিরাজমান পরিস্থিতি বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করেই সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এমন মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর এই আশংকা সত্যে পরিণত হয়।

১৯৫৮ সনের ৭ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার আলী মীর্যা দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। শাসনতন্ত্র বাতিল করা হয়। জাতীয় পরিষদ, প্রাদেশিক পরিষদ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ও প্রাদেশিক মন্ত্রসভাগুলো ভেংগে দেয়া হয়। প্রধান মার্শাল ল এডমিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন সেনা প্রধান জেনারেল মুহাম্মাদ আইউব খান।

প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের আরেক দৃশ্য দেখা গেলো ২৭শে অক্টোবর। ঐ দিন জেনারেল মুহাম্মাদ আইউব খানের চাপের মুখে প্রেসিডেন্ট পদে ইস্তাফা দেন ইসকান্দার আলী মীর্যা। শুধু ক্ষমতা ছাড়তেই নয়, দেশ ছাড়তেও তিনি বাধ্য হন। জেনারেল মুহাম্মাদ আইউব খান নিজেই প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

সামরিক শাসন কায়েম হওয়ায় সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ হয়ে যায়। জামায়াতে ইসলামীও রাজনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।

৪৯. সাইয়েদ আবুল আ'লার দ্বিতীয় বিদেশ সফর

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী অবিরাম লিখে চলছিলেন তাফহীমুল কুরআন। আল কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিভিন্ন নবীর কার্যাবলী আলোচনা করতে গিয়ে

তাঁদের বিচরিত বিভিন্ন স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন। ঐ সব স্থান দেখার দারুণ আগ্রহ ছিলো সাইয়েদ আবুল আ'লার মনে।

১৯৫৯ সনের ৩রা নভেম্বর তিনি করাচী থেকে সমুদ্র পথে যাত্রা করে ৮ই নভেম্বর বাহরাইন পৌঁছেন। রাজধানী মানামা থেকে আকাশপথে তিনি খুবার পৌঁছেন ১০ই নভেম্বর। ১১ই নভেম্বর রাস তানুরাহ ও ১৩ই নভেম্বর বাকিক সফর করেন।

১৩ই নভেম্বর তিনি পৌঁছেন সউদী আরবের অন্যতম শহর দাহরান। ১৪ই নভেম্বর তিনি দাম্মাম পৌঁছেন। ১৫ই নভেম্বর উক্ত অঞ্চলের গভর্ণর সাইয়েদ আবুল আলা'র সম্মানে লাঞ্চের আয়োজন করেন এবং এয়ারপোর্ট হোটেলে রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেন। ১৮ই নভেম্বর তিনি ট্রেনযোগে সউদী আরবের রাজধানী রিয়াদ পৌঁছেন। রিয়াদে তিনি শায়খ আবদুল আযীয বিন বায, উস্তাদ হামাদুল জাসার, শায়খ মিনাহ আলকাতান, আবদুল্লাহ ফিলবী প্রমুখ ইসলামী চিন্তাবিদদের সাথে সাক্ষাত ও মত বিনিময় করেন।

রিয়াদের গর্ভণর আমীর আবদুল্লাহ তাঁর সম্মানে এক ডিনারের আয়োজন করেন। আমীর আবদুল্লাহ তাঁকে দারইয়াহ সফরের আমন্ত্রণ জানান।

২৩শে নভেম্বর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী দারইয়াহ পৌঁছেন। উল্লেখ্য যে দারইয়াহ ছিলো ছোট্ট একটি রাজ্য যার আমীর ছিলেন সাউদী রাজ বংশের পূর্বপুরুষ মুহাম্মাদ ইবনুস সাউদ। উয়াইনা থেকে শায়ক মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব (রহ) দারইয়াহ এসে আমীর মুহাম্মাদ ইবনুস সাউদের নিকট ইসলামের খাঁটি রূপ তুলে ধরেন। আমীর মুহাম্মাদ তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে দারইয়াহকে একটি ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করেন। আজকের সাউদী আরব সেই রাষ্ট্রের সম্প্রসারিত রূপ। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঐতিহাসিক স্থানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেন।

২৮শে নভেম্বর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আকাশ পথে জিদ্দা পৌঁছেন। জিদ্দা এয়ারপোর্টে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত চৌধুরী আলী আকবার তাঁকে রিসিভ করেন। রাষ্ট্রদূত তাঁর সম্মানে একটি ডিনারের আয়োজন করেন। জিদ্দার গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও এতে যোগ দেন। জিদ্দাতে বাস করতেন শায়খ মুহাম্মাদ নাসিফ নামক একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর বাড়িতে গিয়ে তার সাথে সাক্ষাত করেন। ৩০শে নভেম্বর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী মাক্কা পৌঁছেন এবং ১লা ডিসেম্বর উমরাহ করেন। মাক্কায় অবস্থানকালে তিনি দারুল আরকাম, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) জন্মস্থান, শিয়াবে আবু তালিব, মাসজিদে রাইয়া, মাসজিদে জিন, আলমায়াল্লা কবরস্থান, জাবালুন্নুর, মিনা, মাশআরুল হারাম, মুযদালিফা, আরাফাত প্রান্তর, সাউর পাহাড় প্রভৃতি স্থান দর্শন করেন।

৪ঠা ডিসেম্বর তিনি মোটর গাড়িতে করে তায়েফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং রাত দশটায় তায়েফ পৌছেন। ৫ই ডিসেম্বর তায়েফের নিকটবর্তী বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান দেখেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) তায়েফের মুশরিকদের নিক্ষিপ্ত কংকরের আঘাতে জর্জরিত হয়ে যেই স্থানটিতে বসে বিশ্রাম নিয়েছিলেন ও আদ্দাস নামক একজন নিনেভাবাসী ক্রীতদাস তাঁকে আংগুর খেতে দিয়েছিলেন সেই স্থানটিতে রয়েছে একটি মাসজিদ। সাইয়েদ আবুল আ'লা সেই স্থানটিও দেখেন। তায়েফের মাসজিদে আব্দুল্লাহ ইবনুল আব্বাসও তিনি দেখতে যান। এই মাসজিদের পাশেই রয়েছে আল্লাহর রাসূলের (সা) অন্যতম প্রিয় সাহাবী ও চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাসের (রা) কবর। উল্লেখ্য যে তায়েফ অবরোধ কালে মুসলিম বাহিনী এই স্থানটিতেই ক্যাম্প স্থাপন করেছিলো। ৬ই ডিসেম্বর উকায ও হুনাইন হয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী মাক্কা পৌছেন।

৭ই ডিসেম্বর তিনি ঐতিহাসিক হুদাইবিয়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার স্থান হুদাইবিয়া জনপদ পরিদর্শন করেন ও রাতে মাক্কায় ফিরে আসেন।

৮ই ডিসেম্বর তিনি জিদ্দা পৌছেন।

১২ই ডিসেম্বর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী স্থলপথে মাদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। মাসতুরা, মুফরাক প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করে তিনি বদর জনপদে প্রবেশ করেন। বদরের যুদ্ধের ময়দান, বদরের শহীদদের কবর, যুদ্ধকালে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) অবস্থান স্থল দর্শন করে সংগীদের নিয়ে তিনি আলওয়াসতা, আলহামরা ও যুল হুলাইফা হয়ে ১৩ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মাদীনায় পৌছেন। মাদীনায় তিনি প্যালেস হোটেলে অবস্থান করেন। রাতেই তিনি মাসজিদে নববীতে যান, সালাত আদায় করেন ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) উদ্দেশ্যে সালাতও সালাম পেশ করেন।

১৪ ডিসেম্বর তিনি মাদীনা অঞ্চলের আমীরের সাথে সাক্ষাত করেন। ১৫ই ডিসেম্বর তিনি উহুদ প্রান্তরে যান এবং মহানবী (সা) ও সাহাবীদের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলো দেখেন। ঐদিন বিকেলে তিনি কুবা মাসজিদে যান। সেখানে সালাতুল আছর আদায় করেন। আরো কিছু স্থান দেখে তিনি হোটেলে ফিরে আসেন। ১৬ই ডিসেম্বর তিনি বিরে উসমান, মাসজিদে কিবলাতাইন, আকীক উপত্যকা, সালা পাহাড়, জুবাব মাসজিদ, মাসজিদুল ফাতহ, পাঁচ মাসজিদ, সাকীফা বানু সায়েদাহ, আবু আইউব আনসারীর (রা) বাড়ি প্রভৃতি স্থান দেখেন।

১৮ই ডিসেম্বর আল বাকী কবরস্থান দেখতে যান। এই কবরস্থানে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) বহু সংখ্যক প্রিয়জন ও সাহাবীর কবর রয়েছে।

২০শে ডিসেম্বর ওয়াদিউল কুরা পৌছেন। ২১শে ডিসেম্বর তিনি আল্লাহর অন্যতম নবী সালিহ (আ) এর স্মৃতি বিজড়িত স্থান মাদায়েনে সালিহ (আল হিজর) পৌছেন। এটি ছিলো সামুদ জাতির বসতি স্থল।

২৩শে ডিসেম্বর তিনি পৌছেন খাইবার। তিনি সেই রণাংগন দেখেন যেখানে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে খাইবারের ইহুদীদের যুদ্ধ হয়েছিলো। তিনি বিভিন্ন দুর্গের ধ্বংসাবশেষও দেখেন। ২৫শে ডিসেম্বর তিনি তাইমা পৌছে সেখানেই রাত কাটান। ২৬শে ডিসেম্বর তিনি তাবুক পৌছেন। এখানে তিনি সরকারী গেস্ট হাউসে উঠেন। ২৭শে ডিসেম্বর তিনি তাবুকের বিভিন্ন স্থান দেখার জন্য বের হন। সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নেতৃত্বে রোমান সৈন্য বাহিনী মাদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে চাপ সৃষ্টি করলে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ত্রিশ হাজার মুজাহিদ নিয়ে তাবুক পৌছেন। তাঁর আগমনের খবর পেয়ে সম্রাট হিরাক্লিয়াস সীমান্ত থেকে রোমান সৈন্যদেরকে সরিয়ে নেন। যেই স্থানটিতে মুসলিম সৈনিকেরা তাঁবু গেড়ে অবস্থান করেছিলেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঘুরেফিরে সেই স্থানটি দেখেন। ২৯শে ডিসেম্বর তিনি শুয়াইব (আ) এর কর্মক্ষেত্র মাদাইন দেখে এসে বাদাহ-তে বিশ্রাম নেন।

৩০শে ডিসেম্বর সাউদী আরবের সীমানা পেরিয়ে তিনি তাঁর সাথীদের নিয়ে জর্ডনের আকাবাহ শহরে পৌছেন। অতীতে এই স্থানের নাম ছিলো আইলা। এখানে "আল-ইখওয়ানুল মুসলিমূনের" স্থানীয় শাখার সদস্যরা তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

৩১শে ডিসেম্বর তিনি ওয়াদিয়ে মূসা পৌছেন। এখানে মূসা (আ) তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো কাটান। হারুন (আ) এখানেই ইন্তিকাল করেন। এই উপত্যকায় অবস্থিত জাবালে হারুনের শীর্ষদেশে হারুন (আ) কবরস্থ হন।

এই উপত্যকাতেই প্রাচীন পেত্রা নগরীর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। ঈসা ইবনু মারইয়ামের (আ) জন্মের দুই শত বৎসর পূর্বে নাবাতী নামক একটি জাতির রাজধানী ছিলো এই পেত্রা নগরী। সাইয়েদ আবুল আ'লা শহরের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করেন।

পেত্রা থেকে আলমাযার নামক স্থানে পৌছেন। এখানে যায়িদ ইবনু হারিসাহ (রা), জা'ফর ইবনু আবী তালিব (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রা) সহ মূতাহ যুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের কবর রয়েছে।

১৯৬০ সনের ১লা জানুয়ারী তিনি মৃত সাগরের (Dead Sea) পূর্ব তীরে পৌছেন। এই স্থানটিতে লূত (আ) এর জাতি বসবাস করতো।

ঐদিনই তিনি জর্ডনের রাজধানী আম্মান পৌছেন এবং প্যালেস হোটেলে অবস্থান গ্রহণ করেন। ২রা জানুয়ারী জর্ডনের আল ইখওয়ানুল মুসলিমুনের নেতা আবদুর

রাহমান খালীফাহ তাঁর সম্মানে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। এতে আম্মানের বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিরা যোগ দেন।

৪ঠা জানুয়ারী তিনি সাথীদেরকে নিয়ে ফিলিস্তিনের পথে রওয়ানা হন। আস সালাত শহরে তিনি শুভাকাংখীদের এক সভায় বক্তব্য রাখেন। সেখান থেকে তিনি ওয়াদিয়ে শুয়াইবে পৌছেন। আল্লাহর আযাবে মাদাইন ধ্বংস হয়ে যাবার প্রাককালে শুয়াইব (আ) সেখান থেকে হিজরাত করে এসে এইস্থানে বসবাস করতে থাকেন। এখানে একটি ছোট্ট পাহাড়ের ওপর তাঁর কবর রয়েছে।

জর্ডন নদী পার হয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ফিলিস্তিন ভূ-খন্ডে পৌছেন। বিকেল তিনটায় তিনি বহু সংখ্যক নবীর স্মৃতি বিজড়িত শহর জেরুসালেম পৌছেন। এখানে আল ইখওয়ানুল মুসলিমূনের একটি মিটিংয়ে তিনি বক্তব্য রাখেন। অতপর তিনি মাসজিদুল আকসাতে সালাতুল মাগরিব ও সালাতুল ইশা আদায় করেন।

৫ই জানুয়ারী জেরুসালেম থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত বাইতুল লাহাম (Bethelhem) দর্শন করেন। এই স্থানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঈসা ইবনু মারইয়াম(আ)।

সেখান থেকে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী হেবরন বা আল খালীল পৌছেন। নামরূদের উর নগরী থেকে হিজরাত করে ইবরাহীম (আ) হেবরন এসে বসতি স্থাপন করেন। এখান থেকেই তিনি ফিলিস্তিন, হিজায ও মিসর রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচার করতেন। এখানে একটি গুহায় ইবরাহীম (আ) ও তাঁর বংশধরদের কবর রয়েছে। পাশেই রয়েছে একটি মাসজিদ। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর সাথীদের নিয়ে এই মাসজিদেই সালাতুজ-জুহর আদায় করেন।

সেখান থেকে তিনি বানু নায়ীম পৌছেন। এখানে একটি ছোট্ট পাহাড়ের উপর লূত (আ) এর কবর রয়েছে। আল্লাহর আযাবে তাঁর কাউমের বসতিস্থল ধ্বংস হয়ে যাবার প্রাক্কালে হিজরাত করে তিনি এই স্থানে এসে বসতি স্থাপন করেন।

৬ই জানুয়ারী তিনি মাসজিদুল আকসা, কুব্বাতুস সাখরা ও অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থান ঘুরে ঘুরে দেখেন।

৭ই জানুয়ারী তিনি মিউজিয়াম দর্শন করেন। ৭ই জানুয়ারী রাতে তিনি জেরুসালেম থেকে আম্মান পৌছেন।

৮ই জানুয়ারী তিনি আম্মানে আল ইখওয়ানুল মুসলিমূন পরিচালিত "কুল্লিয়াতুল ইসলামীয়া" (ইসলামীয়া কলেজ) পরিদর্শন করেন।

৯ই জানুয়ারী জর্ডন সরকার তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাবেশে তিনি বক্তব্য পেশ করেন।

১০ই জানুয়ারী তিনি "আসহাবে কাহফের" গুহাটি দেখতে যান। গুহাটি আম্মান থেকে ৭ মাইল দূরে রাজিব নামক স্থানে অবস্থিত। অবশ্য ভিন্ন মতে, আসহাবে কাহফের গুহাটি তুর্কীর এফসুস নামক স্থানে অবস্থিত।

ওখান থেকে তিনি ইরবাদ পৌছেন। ১১ই জানুয়ারী তিনি ফাহল পৌছেন। এখানেই উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) শাসন কালে রোমান বাহিনীর সংগে মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধক্ষেত্র দেখার পর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী মুয়ায ইবনু জাবাল (রা), আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা) শুরাহবীল ইবনু হাসনা (রা) ও যারার ইবনু আযওয়ার (রা) এর কবর দর্শন করেন।

ফাহল থেকে ইরবাদ পৌছে আরেকপথ ধরে তিনি ইয়ারমুক প্রান্তরে পৌছেন। উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) শাসনকালে এখানে সংঘটিত হয়েছিল মুসলিম বাহিনী ও রোমান বাহিনীর মধ্যে বড়ো রকমের এক যুদ্ধ।

অতপর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সিরিয়ার রাজধানী দামেসকের পথ ধরেন। ১২ থেকে ১৪ই জানুয়ারী তিনি এখানে অবস্থান করে বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন।

১৫ই জানুয়ারী তিনি দামেসক থেকে আকাশপথে কায়রো পৌছেন। পাকিস্তান এমবেসীর কর্মকর্তারা তাঁকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করেন। তিনি গ্র্যান্ড হোটেলে উঠেন।

১৬ই জানুয়ারী মিসরে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত খাজা শাহাবুদ্দীন তাঁর সম্মানে এক সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। ঐ তারিখে রাতে আল্লামা মুহাম্মাদ আল বাশীর আল ইব্রাহীমী তাঁর সম্মানে ডিনারের আয়োজন করেন। এতে কায়রোর সেরা ইসলামী ব্যক্তিরা যোগ দেন।

১৭ই জানুয়ারী তিনি পিরামিডগুলো ও কায়রো মিউজিয়াম দেখেন।

১৯শে জানুয়ারী তিনি আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং রেকটার মুহাম্মাদ মাহমুদ সালতুতের সাথে সাক্ষাত করেন। কায়রোতে অবস্থানকালে তিনি বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান দেখেন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত করেন।

২০শে জানুয়ারী তিনি কায়রো থেকে ২৫ মাইল দূরবর্তী সুয়েজ পৌছেন। রাতে তিনি সুয়েজে থাকেন।

২১শে জানুয়ারী তিনি সিনাই উপত্যকার দিকে রওয়ানা হন। সুয়েজ থেকে ১৪ মাইল দূরে রয়েছে আইওয়ান মূসা নামক একটি জনপদ। মূসা (আ) তাঁর অনুসারীদেরকে নিয়ে মিসর থেকে বেরিয়ে এখানে কিছু সময় অবস্থান করেছিলেন। এরপর তিনি পৌছেন ঈলাম উপত্যকা। অতপর তিনি আবু যানীমা বন্দরে পৌছেন।

এটি সুয়েজ থেকে ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত। আবু যানীমা থেকে তিনি ফারান মরুদ্যান অতিক্রম করে সেন্টক্যাথেরাইন গীর্জা এলাকায় পৌছেন।

২২শে জানুয়ারী তিনি তাঁর সংগীদের নিয়ে জাবালে মূসার দিকে অগ্রসর হন। এখানে কোন রাস্তা না থাকায় বেশ কিছু দূর তাঁদেরকে উটের পিঠে বসে যেতে হয়। এখানে অবস্থান কালেই আল্লাহর সাথে মূসা (আ) কথা বলেন। জাবালে মূসা থেকে এসে রাতে সেন্টক্যাথেরাইন এলাকায় অবস্থান করেন।

২৩শে জানুয়ারী তিনি কায়রোর পথ ধরেন। পথিমধ্যে তিনি একটি উপত্যকায় পৌছেন যেখানে সালিহ (আ) এর কবর রয়েছে। তাঁর এলাকায় আল্লাহর আযাব নাযিলের পূর্বে হিজরাত করে তিনি এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন। ২৩শে জানুয়ারী রাতে তিনি কায়রো পৌছেন। ২৪ তারিখে আল আযহারে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টারের সাথে তিনি এক ডিনারে মিলিত হন।

২৫শে জানুয়ারী রাতে তিনি আকাশ পথে কায়রো থেকে দামেস্ক পৌছেন। দামেস্ক থেকে পৌছেন কুয়েত। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিনি কুয়েত অবস্থান করেন।

৫ই ফেব্রুয়ারী সকাল বেলা তিনি কুয়েত থেকে করাচী পৌছেন। পরদিন তিনি পৌছেন লাহোর।

এইভাবে ১৯৬০ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারী শেষ হয় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর দ্বিতীয় বিদেশ সফর।

৫০. মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপকার

সাউদী আরবের কিং-এর আমন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ১৯৬১ সনের ডিসেম্বর মাসে রিয়াদ পৌছেন। কিং একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন এবং একটি পরিকল্পনা তৈরি করে দেবার জন্য সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর প্রতি আহ্বান জানান।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলেন অল্প সময়ের মধ্যেই। তিনি প্রস্তাব করেন যে, এই বিশ্ববিদ্যালয় এমন উন্নতমানের আলিম তৈরি করবে যারা বর্তমান যুগের চাহিদার ইসলামী সমাধান পেশ করার যোগ্যতা সম্পন্ন হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাকার্য হবে নয় বছর। প্রথম স্তর হবে চার বছরের। এই স্তরে শিক্ষার্থীদেরকে আল কুরআন, আল হাদীস, আল ফিকহ, ইসলামের ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান পড়ানো হবে। দ্বিতীয় স্তর হবে তিন বছরের। এই স্তরে থাকবে পাঁচটি ফ্যাকাল্টি। যথাঃ আত্ তাফসীর ফ্যাকাল্টি, আল হাদীস ফ্যাকাল্টি, আল ফিক্‌হ ফ্যাকাল্টি, ইল্‌মুল কালাম ফ্যাকাল্টি, ও

ইসলামের ইতিহাস ফ্যাকাল্টি। তৃতীয় স্তর হবে দুই বছরের। এই স্তরে উপরোক্ত যেই কোন একটি ফ্যাকাল্টিতে একজন স্কলার গবেষণা কাজে নিয়োজিত হবেন।

তিনি আরো প্রস্তাব করেন যে এই বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর সকল দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে, বিশ্ব বিদ্যালয়টি হবে আবাসিক, এতে থাকবে একটি বিশাল সমৃদ্ধ লাইব্রেরী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য একটি সংস্থাও থাকবে।

১৯৬১ সনের ২১শে ডিসেম্বর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, চৌধুরী গোলাম মুহাম্মাদ ও খলীল আহমাদ হামিদী কিং-এর প্রাসাদে গিয়ে তাঁর কাছে এই পরিকল্পনা হস্তান্তর করেন। কিং-এর নির্দেশে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, শায়খ মুহাম্মাদ আকবার, শায়খ আবদুল লতীফ, শায়খ মুহাম্মাদ আলী আল হারাকান পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করেন।

এই পরিকল্পনার ভিত্তিতেই স্থাপিত হয় মাদীনার ইসলামী বিশ্ববিদালয়। এর প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলার হন মুহাম্মাদ আলী আল হারাকান। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সিন্ডিকেটের একজন সদস্য নিযুক্ত হন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

১৯৬২ সনের জানুয়ারী মাসে তিনি দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের মিটিংয়ে যোগদানের জন্য মে মাসে আবার সাউদী আরব সফরে যান।

১৯৬২ সনের মে মাসেই গঠিত হয় "রাবিতাতুল-আলম-আল ইসলামী।" সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন।

৫১. ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক "মুসলিম পারিবারিক আইনের" বিরোধিতা

১৯৬১ সনের ২রা মার্চ প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খান একটি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে মুসলিম পারিবারিক আইন জারি করেন। এই আইনে দাদার বর্তমানে পিতা মারা গেলে নাতিকে সরাসরি দাদার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করার বিধান রাখা হয়। তালাক সংক্রান্ত কতগুলো বিধান সন্নিবেশিত হয় যা ইসলামী ভাব ধারার সাথে সাংঘর্ষিক।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এই আইনের ইসলামী শারীয়াহ পরিপন্থী বিধানগুলোর সমালোচনা করেন। তাঁরই উদ্যোগে দেশের চৌদ্দজন সেরা আলিম লাহোরে একত্রিত হয়ে এই আইনের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরিস কান্দালুভী, মুফতী মুহাম্মাদ হাসান, হাফিয কিফায়েত হাসান ও হাফিয আবদুল কাদির রূপারী। ১৯৬১ সনের ১৪ই মার্চ যুক্ত বিবৃতির মাধ্যমে তাঁরা এই আইন প্রত্যাহার করে নেবার জন্য সরকারের প্রতি

আহ্বান জানান। জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরাও নানাভাবে আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন।

৫২. ১৯৬২ সনের শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রায়নের দাবি

১৯৬০ সনের মে মাসে প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খান বিচার প্রতি শাহাবুদ্দিনকে চেয়ারম্যান করে একটি কনষ্টিটিউশান কমিশন গঠন করেন। দেশের জন্য যুগোপযোগী একটি শাসনতন্ত্রের প্রস্তাব তৈরি করার ভার ন্যস্ত হয় কমিশনের ওপর। কমিশন একটি প্রশ্নমালা প্রকাশ করে ও সুধী জনের কাছ থেকে উত্তর আহ্বান করে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী প্রশ্নমালার জওয়াব তৈরি করেন। তাঁর জওয়াব প্রকাশের জন্য প্রেসে পাঠানো হয় এবং বিভিন্ন পত্রিকা তা প্রকাশও করে। এতে মার্শাল ল কর্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট হন। তাঁকে লাহোরের মার্শাল ল প্রশাসকের অফিসে ডেকে নেয়া হয়। কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানান যে তাঁর জওয়াব পত্রিকায় প্রকাশ করাটা মার্শাল ল-এর খেলাফ কাজ হয়েছে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেন যে, কমিশন প্রশ্নমালা প্রকাশ করেছে, তিনি সেই প্রশ্নমালার জওয়াব দিয়েছেন এবং তিনি মনে করেন যে তিনি কি জওয়াব দিয়েছেন তা জানার অধিকার রয়েছে জনগণের। তিনি আরো বলেন যে, কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে যে তিনি মার্শাল ল ভংগ করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য কর্তৃপক্ষ আর এই বিষয়ে অগ্রসর হয়নি।

১৯৬১ সনের মে মাসেই কমিশন তার সুপারিশমালা প্রেসিডেন্টের নিকট পেশ করে। কমিশন প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার, প্রত্যক্ষ ভোট, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ ও একজন ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদ সৃষ্টির সুফারিশ করে।

অক্টোবর মাসে প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খান রাওয়ালপিন্ডিতে গভর্ণরদের মিটিংয়ে সুপারিশগুলো আলোচনা করেন এবং বেশির ভাগ সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করেন। অতপর প্রেসিডেন্টের মর্জি মতো একটি শাসনতন্ত্র রচিত হয়।

১৯৬২ সনের ১লা মার্চ প্রেসিডেন্ট এই শাসনতন্ত্র জারির ঘোষণা দেন। এই শাসনতন্ত্রে বিধান রাখা হয়েছিলো ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বাররা— যাদের সংখ্যা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ছিলো ৪০ হাজার ও পশ্চিম পাকিস্তানে চল্লিশ হাজার এবং যাদেরকে নাম দেয়া হয়েছিলো মৌলিক গণতন্ত্রী (Basic Democrats)— দেশের প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন করবে। এই শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে নির্বাচনও হয়ে যায়।

১৯৬২ সনের ৮ই জুন রাওয়ালপিন্ডিতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসে এবং জেনারেল মুহাম্মাদ আইউব খান "রিপাবলিক অব পাকিস্তানের" দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট

হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ঐ দিনই মার্শাল ল তুলে নেয়া হয়। কিন্তু তখনো রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিলো।

১৯৬২ সনের ১৭ই জুলাই রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়। আর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে জামায়াতে ইসলামী দেশের সর্বত্র নতুন উদ্দীপনা নিয়ে কর্মমুখর হয়ে উঠে।

মার্শাল ল তুলে নেয়ার পর জামায়াতে ইসলামীর প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয় রাওয়ালপিন্ডির লিয়াকতবাগে। এই জনসভায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঘোষণা করেন যে পাকিস্তানকে ইসলামের আবাসভূমি বানাবার সংগ্রাম চলবে, এই সংগ্রাম চলবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে। তিনি আরো বলেন যে দেশের মানুষের ওপর যেই শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তা একনায়কতান্ত্রিক। পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে একটি শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে, এটি মোটেই গণতান্ত্রিক নয়।

১৯৬২ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর লাহোরের মুচি গেটে অনুষ্ঠিত জনসভায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক অবস্থার ক্রমাবনতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন দেশের অর্থ-সম্পদের সিংহভাগ ২২২ পরিবারের হাতে রয়েছে, অথচ দরিদ্র মানুষেরা দিন দিন আরো দরিদ্র হচ্ছে। ভাষণে তিনি আরো বলেন যে, পাকিস্তান অর্জিত হয়েছিলো ইসলামের নামে, দুর্ভাগ্যের বিষয়, পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার পর এমন সব লোক রাষ্ট্র-ক্ষমতা কেড়ে নেয় যারা একদিকে ইসলাম, অন্যদিকে গণতন্ত্রের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তিনি "মৌলিক গণতন্ত্রের"ও সমালোচনা করেন। তিনি দাবি করেন যে–

১। দেশের জীবন বিধান হতে হবে আস্ কুরআন ও আল-সুন্নাহ ভিত্তিক জীবন বিধান।

২। কোন শ্রেণী নয়, জনগণ হবে ক্ষমতার মালিক।

৩। সরকার গঠন করবেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা।

৪। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে যাঁরা নির্বাচিত হবেন তাঁরাই জনগণের প্রতিনিধি বলে গণ্য হবেন।

৫। সকল ব্যক্তি ও দলের মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকতে হবে।

৬। সরকার রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য গণমাধ্যম এক তরফাভাবে ব্যবহার করবেন না।

৫৩. তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে তৃতীয় সফর

১৯৬২ সনের নভেম্বর মাসে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তৃতীয়বার তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন। এবার তিনি সফরে ছিলেন আঠার দিন। তিনি মহানগরী

ও গুরুত্বপূর্ণ জিলাকেন্দ্রগুলোতে যান, জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক রিপোর্ট শুনেন ও প্রয়োজনীয় হিদায়াত দেন। বিভিন্ন জনসভাতেও তিনি বক্তব্য রাখেন। এই সব জনসভায় তিনি শাসনতন্ত্রের গণতন্ত্রায়ন, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরকরণ, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক অবিচারের প্রতিকার এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার দাবিতে বক্তব্য রাখেন।

৫৪. ১৯৬৩ সনের কেন্দ্রীয় সম্মেলনের অর্জন

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী '১৯৬২ সনের শাসনতন্ত্রের অ-গণতান্ত্রিক ধারাগুলোর সমালোচনা করেন। মুসলিম পারিবারিক আইনের ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বিধানগুলো প্রত্যাহারের জোর দাবি জানান। এই সব কারণে একনায়কতান্ত্রিক সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী তাঁর ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে থাকেন।

এই নাজুক পরিস্থিতিতেই সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লাহোরে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সম্মেলন আহ্বান করেন।

ইকবাল পার্কে সম্মেলন অনুষ্ঠানের অনুমতি চাওয়া হয়। অনুমতি দেয়া হয়নি। আরো কয়েকটি বিকল্প স্থানে অনুমতি চাওয়া হয়। এই অজুহাত সেই অজুহাতে অনুমতি দেয়া হয়নি। অবশেষে ভাটি গেটের সন্নিকটে একটি লম্বা ও অ-প্রশস্ত স্থানে সম্মেলন অনুষ্ঠানের অনুমতি দেয়া হয়। এবড়ো থেবড়ো স্থান। মাটি ফেলে এটিকে সমতল করে নিতে হয়। ডেলিগেটদের থাকার স্থান, সালাতের স্থান, খাবারের স্থান, গোসলের স্থান, টয়লেট, সভা অনুষ্ঠানের স্থান, বই-পুস্তকের স্টল ইত্যাদি তৈরি হয়ে গেলো। হাজার হাজার ডেলিগেট আসতে থাকে। কিন্তু এতো বড়ো সম্মেলন নিয়ন্ত্রণের জন্য মাইক ব্যবহারের অনুমতি দিলো না সরকার।

তিন দিনের জন্য ডাকা হয়েছিলো এই সম্মেলন। ১৯৬৩ সনের ২৫ অক্টোবর ছিলো উদ্বোধনের দিন। অনেক দূর বিস্তৃত শামিয়ানার নীচে বসে পড়েন হাজার হাজার মানুষ। যথাসময়ে মঞ্চে আসেন আমীরে জামায়াত সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি লিখিত ভাষণ পড়তে শুরু করেন। শামিয়ানার নীচে কিছু দূরে দূরে রাখা ছিলো টেবিল। নির্দিষ্ট ব্যক্তিরা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর বক্তৃতার কপি হাতে নিয়ে টেবিলে উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা পড়তে শুরু করেন। যদিও সাইয়েদ আবুল আ'লার কণ্ঠ সকলের শুনার সৌভাগ্য হলো না, কিন্তু তাঁর বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন শ্রোতারা।

হঠাৎ শ্রোতাদের একাংশ থেকে কিছু সংখ্যক লোক দাঁড়িয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে গালমন্দ শুরু করে। এই গুন্ডা দলটির দলপতি ছিলো গোলাম মুহাম্মাদ

নামে এক ব্যক্তি। সে স্টেজের দিকে রিভলভার উঁচিয়ে ধরতেই কয়েকজন জামায়াত কর্মী তাকে ধরে ফেলে। এই সময় লোকেরা বলতে থাকে, "মাওলানা আপনি বসে পড়ুন।" সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর কণ্ঠ থেকে ভেসে আসে দৃঢ় উচ্চারণ, "আমি যদি বসে পড়ি দাঁড়িয়ে থাকবে কে?"

গুন্ডাদল সভাস্থল ত্যাগ করে তাঁবুর রশিগুলো কাটতে শুরু করে। কয়েকজন বুক স্টলের দিকে এগিয়ে যায়। তারা তাফসীর তাফহীমুল কুরআনসহ অন্যান্য বই এদিক ওদিক ছুঁড়ে ফেলে। এরপর তারা মহিলাদের তাঁবুর দিকে অগ্রসর হয়। প্রবেশ পথে যাঁরা কর্তব্যরত ছিলেন তাঁদের একজন ছিলেন আল্লাহ বকস। গোলাম মুহাম্মাদের গুলির আঘাতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ও শাহাদাত লাভ করেন।

জামায়াতে ইসলামীর স্বেচ্ছাসেবকেরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। প্রায় ত্রিশ মিনিট সময় চলে যায়। পরিস্থিতি শান্ত হলে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর অসমাপ্ত উদ্বোধনী ভাষণ আবার শুরু করেন। এই ভাষণে তিনি বলেন, "যারা আল্লাহর পথে আন্দোলনে নিবেদিত তাদেরকে অবশ্যই দুইটি গুণের অধিকারী হতে হবে। এইগুলি হচ্ছে ছবর ও হিকমাহ্। ছবরের দাবি হচ্ছে, চলার পথে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলে উত্তেজিত না হওয়া, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে না ফেলা এবং হতাশ হয়ে নিজেদের মিশন পরিত্যাগ না করা। যেই কোন সংকটেই সংকল্পের দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলা উচিত নয়। হিকমাহ্র দাবি হচ্ছে একটি মাত্র কর্ম পদ্ধতিতে আটকে না যাওয়া। একটি পথ বন্ধ হয়ে গেলে নতুন আরেকটি পথ খোলার যোগ্য হওয়া।"

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী পরিস্থিতির শিকার হয়ে কোন কথা বলতেন না, কোন পদক্ষেপও নিতেন না। তিনি আবেগতাড়িত হওয়ার মতো ব্যক্তি ছিলেন না। এতো বড়ো ঘটনা ঘটে গেলো। কিন্তু তাঁর বক্তৃতায় তার কোন প্রতিফলন ঘটেনি। তিনি যা বলার সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছিলেন, তা-ই বলে গেলেন। ঘটনা নিয়ে তিনি মাতামাতি করলেন না। রাতে মাজলিসে শূরার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় পরদিন সকালেই সম্মেলনে উপস্থিত ডেলিগেটরা গ্রুপ গ্রুপ হয়ে লাহোর বাসীদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে জামায়াতে ইসলামীর আহ্বান পৌঁছাবে। কেউ কেউ পরিস্থিতির নাজুকতা তুলে ধরেন। কিন্তু দূরদর্শী সাইয়েদ আবুল আ'লা বুঝাতে সক্ষম হন যে এইটিই মানুষের কাছে যাওয়ার উত্তম সময়।

২৬শে অক্টোবর জামায়াতে ইসলামীর ডেলিগেটরা শহরে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা ২৮,৮৭২ জন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত ও আলাপ করেন। তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ৫২৭৪ জন সহযোগী সদস্য ফরম পূরণ করেন। ২৭শে অক্টোবর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সম্মেলনের সমাপনী ভাষণে বলেন, "আমি জানি কে এই গুন্ডাদেরকে

ভাড়া করে এনেছে। সরকারের উদ্দেশ্য ছিলো জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদেরকে উসকিয়ে সহিংস পথে নিয়ে যাওয়া যাতে করে বাহানা বানিয়ে সম্মেলনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যায়। আল্লাহর শুকরিয়া যে জামায়াতে ইসলামী এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। জামায়াত কর্মীরা ছবর ও হিকমাহ অবলম্বন করেছেন। এর ফলে তাঁরা যে কেবল বিরুদ্ধবাদীদের চক্রান্ত নস্যাত করতে পেরেছেন তাই নয়, আশাতীতভাবে তাঁরা সম্মেলনের উদ্দশ্যও পূরণ করতে পেরেছেন।"

সাইদেয় আবুল আ'লা মওদূদী জামায়াতে ইসলামীর জনশক্তিকে বলেন যে বাইরে থেকে যেই সব বিপদ আসে সেইগুলোর তোয়াক্কা না করে তাদের উচিত ভিতরের বিপদ তথা তাদের নিজেদের দুর্বলতার ওপর বিজয় লাভ করা।

৫৫. তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে চতুর্থ সফর

১৯৬৩ সনের নভেম্বর মাসে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী চতুর্থবারের মতো তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। এই সফরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো জামায়াতে ইসলামীর প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদান করা। এই সফর কালে ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভাতেও তিনি বক্তৃতা করেন।

৫৬. জামায়াতে ইসলামীকে বে-আইনী ঘোষণা ও সাইয়েদ আবুল আ'লার তৃতীয় গ্রেফতারী

প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খান দারুণ নাখোশ ছিলেন জামায়াতে ইসলামী ও সাইয়েদ আবুল আ'লার ওপর। জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সম্মেলন বানচাল করার জন্য অনেক কিছুই তিনি করেছেন। কিন্তু সবই হলো বুমেরাং। এতে তাঁর আক্রোশ আরো বেড়ে যায়।

প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খানের নির্দেশে ১৯৬৪ সনের ৬ই জানুয়ারি তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান সরকার জামায়াতে ইসলামীকে বে-আইনী ঘোষণা করে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীসহ জামায়াতে ইসলামীর ৬০ জন নেতাকে গ্রেফতার করা হয়।

জামায়াতে ইসলামীর জনশক্তি আবারো পরীক্ষার সম্মুখীন হন। কিন্তু লাহোর সম্মেলনে প্রদত্ত সাইয়েদ আবুল আ'লার দিক-নির্দেশনা তাঁদের মনে তখনো তাজা। এই বিপদের মুকাবিলা করতে হবে ছবর ও হিকমাহর সাথে।

সরকার অভিযোগ করে যে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছে, কাশ্মীর জিহাদকে না-জায়েয মনে করে, সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টা চালায়, সরকারী কর্মচারীদের আনুগত্যশীলতা বিনষ্ট করে, ছাত্রদের মাঝে অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং বিদেশ থেকে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করে।

জামায়াতে ইসলামী সরকারের বানোয়াট অভিযোগ ও বে-আইনী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আইনী লড়াই চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। মিঃ এ.কে. ব্রোহীর নেতৃত্বে গঠিত একটি টীমের ওপর মামলা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টে রীট পিটিশান দাখিল করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্ট রীট পিটিশান খারিজ করে দেয়, আর পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট সরকারের অর্ডার বাতিল ঘোষণা করে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জামায়াতে ইসলামী ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে সরকার সুপ্রীম কোর্টে আপীল পেশ করে। আল্লাহর শুকরিয়া, সুপ্রীম কোর্ট জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে রায় দেয়। ১৯৬৪ সনের ৯ অক্টোবর জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ জেল থেকে মুক্তি পান।

৫৭. প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মিস ফাতিমা জিন্নাহর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন

প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খানের অ-গণতান্ত্রিক শাসনে দেশের মানুষের নাভিশ্বাস অবস্থা দেখা দেয়।

১৯৬৫ সনের গোড়ার দিকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা। আশি হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীরা ভোটার। এমতাবস্থায় অন্য কারো নির্বাচনে পাস করার সম্ভাবনা ছিলো ক্ষীণ। কিন্তু বিনা চ্যালেঞ্জে প্রেসিডেন্ট আইউব খানকে আবারো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে দেয়া যায় না। এই বিষয়ে ১৯৬৪ সনে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মত বিনিময় হয়। ঢাকার নওয়াব পরিবারের সন্তান খাজা নাজিমুদ্দীন এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 'কম্বাইন্ড অপোজিশান পার্টিজ' নামে সরকার বিরোধী একটি রাজনৈতিক ঐক্যজোট গড়ে উঠে।

১৯৬৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে 'কম্বাইন্ড অপোজিশান পার্টিজ' পাকিস্তানের স্থপতি মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর বোন মিস ফাতিমা জিন্নাহকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মনোনীত করে। এই সময় জামায়াতে ইসলামী ছিলো নিষিদ্ধ। সাইয়েদ আবুল আ'লা সহ জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ ছিলেন বন্দি।

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মাজলিসে শূরার যেই সব সদস্য জেলের বাইরে ছিলেন তাঁরা ১৯৬৪ সনের ২রা অক্টোবর মিটিংয়ে একত্রিত হন। মিস ফাতিমা জিন্নাহকে সমর্থন করা বা না করা সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচনান্তে মাজলিসে শূরা অভিমত ব্যক্ত করে যে স্বাভাবিক অবস্থায় একজন মহিলাকে রাষ্ট্র প্রধান করা সমীচীন নয়, কিন্তু দেশে চলছে এক অস্বাভাবিক অবস্থা, স্বৈরশাসক মুহাম্মাদ আইউব খানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে মিস ফাতিমা জিন্নাহর কোন বিকল্প নেই। এমতাবস্থায় সার্বিক অবস্থার নিরিখে জামায়াতে ইসলামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মিস ফাতিমা জিন্নাহকেই সমর্থন করবে।

জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে সুপ্রীম কোর্টের রায় ঘোষিত হবার পর ১৯৬৪ সনের ৯ই অক্টোবর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী জেল থেকে বেরিয়ে আসেন। তিনি জামায়াতে ইসলামীর মাজলিসে শূরার সিদ্ধান্তের সাথে একমত হন।

উল্লেখ্য যে ১৯৬৪ সনের ২২ অক্টোবর খাজা নাজিমুদ্দীন ইন্তিকাল করেন।

এই সময় প্রেসিডেন্ট আইউব খান কয়েকজন উলামা মাশায়েখ থেকে ফাতওয়া হাছিল করেন যে, একজন মহিলা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হতে পারেন না। জামায়াতে ইসলামীর সদস্যদের মধ্যেও এইসময় কিছুটা বিভ্রান্তি দেখা দেয়। লাহোরের আমীর কাউসার নিয়াযী বলেন যে, খোদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর বিভিন্ন বইতে লিখেছেন যে একজন মহিলা ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান হতে পারেন না, এখন কিনা তিনিই একজন মহিলাকে প্রেসিডেন্ট বানাতে চাইছেন। কাউসার নিয়াযী জামায়াতের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন।

উলামা মাশায়েখ প্রদত্ত ফাতওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেন, "যাঁরা অভিযোগ করেন যে আমি সুবিধা মতো আমার মত পরিবর্তন করি তাঁদের প্রতি আমার জিজ্ঞাসাঃ ইসলাম কি একজন মহিলাকে মন্ত্রী ও রাষ্ট্রদূত বানাবার অনুমতি দেয়? ইসলাম কি সহশিক্ষার অনুমতি দেয়? ইসলাম কি পুরুষ ও মহিলাদেরকে একই অফিসে পাশাপাশি বসে কাজ করার অনুমতি দেয়? ইসলাম কি মহিলাদেরকে এয়ার হোস্টেস হয়ে পুরুষদের মদ- পরিবেশন করার অনুমতি দেয়? এইগুলো যদি নিষিদ্ধ হয় তাহলে এতোকাল এইসব বিষয়ে আপনারা কথা বলেন কি কেন? আপনারা শুধু একজন মহিলার রাষ্ট্র প্রধান পদপ্রার্থী হওয়ার বিষয়ে ইসলামের ব্যাপারে জাগলেন কেন?" সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আরো বলেন যে, এটি সু-প্রতিষ্ঠিত যে শারীয়াহর নিরিখে রাষ্ট্র-পরিচালনার দায়িত্ব মহিলাদের নেই, কাজের এই ক্ষেত্রটি পুরুষদেরই। বর্তমান মুহূর্তে একজন মহিলা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন কি পারেন না- তা বিবেচ্য বিষয় নয়। প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে এমন এক ব্যক্তির ডিকটেটরিয়াল শাসন থেকে জাতিকে মুক্ত করা যায় যিনি ইসলামী মূল্যবোধের অবনতির জন্য দায়ী। আইউব খানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আমাদের প্রয়োজন এমন এক ব্যক্তিকে পাওয়া যিনি জাতির শ্রদ্ধাভাজন। এই প্রেক্ষাপটে আমরা জাতির স্থপতির বোন মিস ফাতিমা জিন্নাহর চেয়ে উত্তম ও অধিক প্রিয় আর কোন ব্যক্তি দেখছি না। আমরা যদি মিস ফাতিমা জিন্নাহর পক্ষে না দাঁড়াই তার অর্থ হয় আইউব খানকে সমর্থন করা। আমাদেরকে দুইটি মন্দের একটি গ্রহণ করতে হবে ঃ হয় আমাদেরকে একজন মহিলাকে সমর্থন করতে হবে, নয়তো

সমর্থন করতে হবে একজন অত্যাচারীকে। একজন অত্যাচারীকে সমর্থন করার চেয়ে একজন মহিলাকে সমর্থন করা কম মন্দ। বর্তমান মুহূর্তের বিশেষ অবস্থায় (in the special circumstances) প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে একজন মহিলাকে সমর্থন করা ইসলামের বিরুদ্ধে যাওয়া নয়।'

দ্রষ্টব্য ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এন্ড হিজ থট, প্রফেসর মাসুদুল হাসান, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা- ১৭৯

৫৮. তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে চতুর্থ সফর

জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের করাচী, লাহোর, পেশাওয়ার, সারগোদা প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণ দেন। ১৯৬৪ সনের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে তিনি ঢাকা আসেন। তিনি ২৭শে নভেম্বর ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তব্য রাখেন। তিনি ২রা ডিসেম্বর নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ ও ৪ঠা ডিসেম্বর চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তৃতা করেন।

৫৯. ১৯৬৫ সনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

১৯৬৫ সনের ২রা জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আশি হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী ছিলো ভোটার। মিস ফাতিমা জিন্নাহ নির্বাচনে বিজয়ী হলে মৌলিক গণতন্ত্র বিলুপ্ত হবে তা জেনে মৌলিক গণতন্ত্রীদের তাঁকে ভোট দেয়া সহজ ব্যাপার ছিল না। যারা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী, বিবেকবান ও সাহসী কেবলমাত্র তাঁদের পক্ষেই 'কম্বাইন্ড অপোজিশন পার্টিজ'-এর নমিনিকে ভোট দেয়া সম্ভব ছিলো।

এই নির্বাচনে আইউব খান পান ৪৯,৬৪৭ ভোট। মিস ফাতিমা জিন্নাহ পান ২৮,৩৪৫ ভোট। দোর্দন্ড প্রতাপশালী প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খানের নানামুখী চাপ ও চোখ রাঙানী উপেক্ষা করে আটাশ হাজারেরও বেশি মৌলিক গণতন্ত্রী মিস ফাতিমা জিন্নাহকে ভোট দেয়ায় স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিলো দেশের রাজনৈতিক হাওয়া কোন দিকে বইছে। স্বৈরশাসক আইউব খানের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা ছিলো খুবই বলিষ্ঠ।

৬০. ১৯৬৫ সনের যুদ্ধকালে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর ভূমিকা

১৯৬৫ সনের অগাস্ট মাসে ভারত-অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরের মুক্তি পাগল মানুষেরা ভারতীয় আধিপত্য রুখে দাঁড়ায়। ভারতীয় সৈন্যদের সাথে তারা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। আযাদ কাশ্মীর থেকে কিছু সংখ্যক মুজাহিদ জম্মু ও কাশ্মীরের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয়। এতে ভারতীয় সেনাবাহিনী ভীত হয়ে

পড়ে এবং পাকিস্তানের একটি গ্রামে গোলা বর্ষণ করে। ফলে পাকিস্তানের সৈন্যরা আযাদ কাশ্মীরের মুজাহিদদেরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যায়।

এই প্রেক্ষাপটে ৬ই সেপ্টেম্বর ভারত যুদ্ধের ঘোষণা না দিয়েই আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে তিন দিক থেকে লাহোর আক্রমণ করে বসে। ভারতীয় সৈন্যদেরকে মুকাবিলা করার জন্য পাকিস্তানী সৈন্যরা দ্রুত রণাংগনে উপস্থিত হয়। দুই তিন দিনের মধ্যে শিয়ালকোট সেকটার ও সিনধের হায়দারাবাদ সেকটারও ভারতীয় আগ্রাসনের শিকার হয়।

৬ই সেপ্টেম্বর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রাওয়ালপিন্ডি ছিলেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার খবর শুনে তিনি লাহোরের পথে রওয়ানা হন। মাঝামাঝি পথে তিনি খবর পান যে প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খান চান সাইয়েদ আবুল আ'লা রাওয়ালপিন্ডিতে ফিরে এসে তাঁর সাথে সাক্ষাত করুন। বিরোধী দলের অন্যান্য যাঁদেরকে প্রেসিডেন্ট ডেকেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন চৌধুরী মুহাম্মাদ আলী, চৌধুরী গোলাম আব্বাস ও নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান।

প্রেসিডেন্ট যুদ্ধ তৎপরতায় বিরোধী দলগুলোর সহযোগিতা কামনা করেন। চৌধুরী মুহাম্মাদ আলী সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। চৌধুরী গোলাম আব্বাস কাশ্মীরীদের পক্ষে ভূমিকা রাখায় সরকারের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এই যুদ্ধকে 'জিহাদ' বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন যে দুশমন বাহিনীকে পরাজিত করার জন্য সরকারের সাথে সহযোগিতা করা পাকিস্তানের প্রতিটি মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য। সাইয়েদ আবুল আ'লার বক্তব্যে প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খান খুবই খুশী হন এবং রেডিও পাকিস্তান থেকে 'আল-জিহাদ' সম্পর্কে কয়েকটি বক্তৃতা করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান।

প্রেসিডেন্ট আইউব খান সাইয়েদ আবুল আ'লার প্রতি দারুণ বিদ্বেষ পোষণ করতেন। তিনি ও তাঁর মন্ত্রীরা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে ছিলেন। আইউব খানের নির্দেশেই দুইটি প্রাদেশিক সরকার জামায়াতে ইসলামীকে বে-আইনী ঘোষণা করেছিলো। সরকার সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ও অন্যান্য নেতাকে অন্যায়ভাবে নয় মাস বন্দী জীবন যাপন করতে বাধ্য করেছিলো। কিন্তু জাতির দুর্যোগ মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট আইউব খান সহযোগিতার অনুরোধ জানালে সাইয়েদ আবুল আ'লা জাতীয় স্বার্থকে সামনে রেখে অকাতরে সরকারের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। জিহাদের জন্য জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে তিনি ১৪, ১৬ ও ১৮ই সেপ্টেম্বর রেডিও পাকিস্তান থেকে ভাষণ দেন।

ভারতের সৈন্য ছিলো পাকিস্তানের সৈন্য সংখ্যার ছয়গুণ বেশি। কিন্তু যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যরা পাকিস্তানের যেই পরিমাণ ভূমি দখল করেছিলো তার চারগুণ বেশি ভারত ভূমি দখল করেছিলো পাকিস্তানী সৈন্যরা। পাকিস্তানী সৈন্যরা চার শত ভারতীয় ট্যাংক ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। তারা ভারতের একশত দশটি জংগী বিমান ভূপাতিত করে। পক্ষান্তরে পাকিস্তানের মাত্র ষোলটি জংগী বিমান ধ্বংস হয়। পাকিস্তান নৌ-বাহিনী ভারতীয় নৌ-ঘাঁটি দ্বারকা-তে আক্রমণ চালিয়ে একটি যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংস করে। পক্ষান্তরে ভারতীয় নৌ-বাহিনী পাকিস্তানের কোন নৌ-ঘাঁটির কাছে ঘেঁষতে পারেনি।

যুদ্ধকালে পাকিস্তানে এক নীরব সামাজিক বিপ্লব ঘটে যায়। 'আল্লাহু' আকবার ধ্বনিতে পাকিস্তানের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে। একটি ইসলামী প্রেরণা গোটা জাতিকে আলোড়িত করে। মাসজিদে মুছাল্লীর সংখ্যা ব্যাপকহারে বেড়ে যায়। অ-সামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। চুরি-ডাকাতি অবিশ্বাস্য রকমের হারে হ্রাস পায়। খুন খারাবী বন্ধ হয়ে যায়। দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল থাকে। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৈন্যদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকে। সরকারী কর্মচারীরা ছুটির দিনেও অফিসে কাজ করে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

সন্দেহ নেই, এই নীরব সামাজিক বিপ্লব সৃষ্টির পেছনে সাইয়েদ আবুল আ'লার অবদান ছিলো উল্লেখযোগ্য।

৬১. আযাদ কাশ্‌মীর সফর

১৯৬৫ সনের নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আযাদ কাশ্‌মীর সফর করেন। আযাদ কাশ্‌মীরে এটাই ছিলো তাঁর প্রথম সফর।

২৬শে নভেম্বর আযাদ কাশ্‌মীরের রাজধানী মুজাফফারাবাদে অবস্থিত মুজাফ্‌ফারাবাদ কলেজ ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় তিনি বক্তৃতা করেন। ২৭শে নভেম্বর তিনি রেডিও মুজাফ্‌ফারাবাদ থেকে কাশ্‌মীরবাসীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি ভারত কর্তৃক ন্যায়-নীতি ও আন্তর্জাতিক আইন লংঘনের সমালোচনা করেন। কাশ্‌মীরে গণভোট অনুষ্ঠানের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে আঞ্চলিক শান্তির পথ রুদ্ধ করায় ভারতের তীব্র সমালোচনা করেন।

আযাদ কাশ্‌মীরে অবস্থানকালে যুদ্ধে আহত সৈনিকদের সেবা ও অধিকৃত জম্মু ও কাশ্‌মীর থেকে আগত হাজার হাজার মুহাজিরের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য জামায়াতে ইসলামীর করণীয় নির্ণয় করেন। আযাদ কাশ্‌মীরের দুইটি জিলায় আটটি মেডিকেল সেন্টার কায়েমের ব্যবস্থা করেন। মুহাজিরদের মধ্যে সকল প্রকারের ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছাবার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

৬২. পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ে বক্তৃতা

১৯৬৫ সনের ১৭ই ডিসেম্বর ইসলামের অর্থনীতির ওপর বক্তৃতা করার জন্য সাইয়েদ আবুল আ'লা আমন্ত্রিত হন। এই আলোচনা সভায় বিদগ্ধ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনীতির বিভিন্ন দিক এমন বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেন যে শ্রোতারা বিস্মিত ও মুগ্ধ হন। এই বক্তৃতায় তিনি ইসলামী অর্থনীতির স্বরূপ, যাকাত ব্যবস্থা, সুদবিহীন ব্যাংক, দ্বীনী-অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক, ভূমি ব্যবস্থা, শ্রম-পুঁজি-ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক, ব্যক্তি মালিকানা, অর্থ-সম্পদ বিনিময়, অর্থ-সম্পদ বন্টন, একচেটিয়া ব্যবসা, মওজুদদারী, একব্যক্তির অর্থ সম্পদে অন্যদের অধিকার ইত্যাদি স্বচ্ছ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করেন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ইসলামের অর্থনীতি সম্পর্কে শ্রোতাদেরকে সুস্পষ্ট ধারণা দান করে।

৬৩. তাসখন্দ চুক্তির বিরোধিতা

১৯৬৫ সনের পাক-ভারত যুদ্ধ চলেছিলো সতর দিন। রণাংগনে ভারতের দুরবস্থা দেখে ভারতের মিত্ররা সারা দুনিয়ায় তোলপাড় শুরু করে দেয়। পাকিস্তানের ওপর যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব চাপিয়ে দেয়। যুদ্ধ থেমে যায়। জোর কূটনৈতিক তৎপরতা চলতে থাকে ভারতের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য।

ভারতের মিত্র রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী এলেকসী কোসিগিনের আহ্বানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ আইউব খান সংগী-সাথীদের নিয়ে গেলেন তাসখন্দ। ১৯৬৬ সনের ১০ই জানুয়ারী তাঁরা একটি শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

চুক্তিতে ছিলো, উভয় পক্ষ সু-প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক গড়ার প্রচেষ্টা চালাবে, পারস্পরিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য শক্তি প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকবে, উভয় পক্ষ অধিকৃত এলাকা থেকে সৈন্য সরিয়ে নেবে, একে অপরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না, এক পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালাবে না, উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য-যোগাযোগ-সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান চালু হবে, যুদ্ধবন্দী বিনিময় হবে, শরণার্থী সমস্যা ও বেআইনী অভিবাসীদের বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চালানো হবে ও পারস্পরিক স্বার্থ বিবেচনার জন্য বিভিন্ন যুক্ত কমিটি গঠিত হবে।

সবই ছিলো সেই চুক্তিতে। ছিলো না শুধু কাশ্মীর প্রসংগ যাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হলো এতো বড়ো যুদ্ধ। যুদ্ধের ময়দানে জয়লাভ করেও কূটনীতির ময়দানে হেরে গেলো পাকিস্তান। ১৯৬৬ সনের ১৬ই জানুয়ারী জামায়াতে

ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একত্রিত হন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, চৌধুরী মুহাম্মাদ আলী, নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান, চৌধুরী মুহাম্মাদ হুসাইন চাত্তা, মালিক গোলাম জিলানী প্রমুখ বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ।

আলোচনান্তে তাঁরা একটি যুক্ত বিবৃতি তৈরি ও প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন যে তাসখন্দ চুক্তিতে কাশ্মীর সমস্যার উল্লেখ নেই, কাশ্মীর যে একটি বিরোধ-পূর্ণ অঞ্চল তার স্বীকৃতি পর্যন্ত নেই। অথচ স্বাক্ষরিত চুক্তি প্রকৃতপক্ষে একটি যুদ্ধ নয় চুক্তি। তারা এই চুক্তির নিন্দা করেন।

১৯৬৬ সনের ৫ ও ৬ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর বড়ো আকারের একটি কনভেনশান অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশানে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী একটি প্রস্তাব পেশ করেন। এই প্রস্তাবে তাসখন্দ চুক্তির নিন্দা করা হয়, এই চুক্তিকে কাশ্মীরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলা হয় এবং বলা হয় জাতি এই চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রস্তাবে আরো বলা হয় যে পাকিস্তানের জনগণ কাশ্মীরীদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। এই প্রস্তাব সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৬৪. তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে পঞ্চম সফর

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ১৯৬৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। এটি ছিলো এই অঞ্চলে তাঁর পঞ্চম সফর। তিনি প্রাদেশিক জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলনে যোগদান করেন। তাছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, খুলনা প্রভৃতি স্থানে জনসভায় বক্তৃতা করেন। ঢাকা ও চট্টগ্রামে তিনি প্রেস কনফারেন্সেও বক্তব্য রাখেন।

৬৫. প্রায় তিন বছর পর আবার সাউদী আরব সফর

১৯৬৪ সনের ৬ই জানুয়ারী সরকার কর্তৃক জামায়াতে ইসলামী বে-আইনী ঘোষিত হবার আগেই সরকার সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করে। ফলে বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি রাবিতাতুল আলম আল-ইসলামীর সম্মেলনে অংশ নেবার জন্য মাক্কায় ও মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মিটিংয়ে অংশ নেবার জন্য মাদীনায় যেতে পারেন নি। ১৯৬৫ সনের যুদ্ধ শেষ হবার পর তাঁর পাসপোর্ট ফেরত দেয়া হয়।

১৯৬৬ সনের মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে তিনি হাজ পালনের জন্য মাক্কায় আসেন। সাথে নিয়ে আসেন কাশ্মীর সমস্যার ওপর ইংরেজী ও আরবীতে ছাপানো পঞ্চাশ হাজার পুস্তিকা। এই পুস্তিকা দুনিয়ার সকল দেশ থেকে আগত শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

তিনি রাবিতাতুল আল-আলম-আল ইসলামী কর্তৃক আমন্ত্রিত দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রায় আটশত বিশিষ্ট ব্যক্তির এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। মাক্কা ও মাদীনায় কর্মমুখর সময় কাটিয়ে তিনি দেশে ফিরেন।

৬৬. অনন্য গ্রন্থ "খিলাফাত ও রাজতন্ত্র" রচনা

১৯৬৬ সনে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ "খিলাফাত ও রাজতন্ত্র" রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি বিশ্ব প্রকৃতি সম্পর্কে ইসলামের ধারণা, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, আল্লাহর রাসূলের (সা) মর্যাদা, খিলাফাতের তাৎপর্য, রাষ্ট্রের আনুগত্যের সীমা, শূরার গুরুত্ব, উলুল আমরের গুণাবলী, শাসনতন্ত্রের মৌলনীতি, মৌলিক অধিকার, নাগরিকদের ওপর সরকারের অধিকার, ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, আদল— সকল মানুষের প্রতি সুবিচার, সরকারের কর্তব্য ও জওয়াবদিহিতা, নেতৃত্ব-পদপ্রার্থী হওয়ার নিষিদ্ধতা, গণ-সমর্থনপুষ্ট সরকার, শূরা ভিত্তিক শাসন, বাইতুল মাল একটি আমানাত, আইনের শাসন, খিলাফাতে রাশেদার বৈশিষ্ট, খিলাফাত থেকে রাজতন্ত্রে পরিবর্তন, খিলাফাত ও রাজতন্ত্রের পার্থক্য প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। এই গ্রন্থ ইসলামের রাষ্ট্র-নীতি ও রাজনীতি সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্নের জওয়াব সরবরাহ করেছে। আর দূর করেছে অনেক অনেক অস্পষ্টতা। ইসলামী রাষ্ট্র-চিন্তার ইতিহাসে এই গ্রন্থ একটি মাইলস্টোন।

৬৭. সাইয়েদ আবুল আ'লার চতুর্থ গ্রেফতারী

১৯৬৭ সনের ১১ই জানুয়ারী ছিলো ২৯শে রমাদান। ঐদিন আকাশ ছিলো পরিষ্কার। চাঁদ উঠলে সকল স্থান থেকেই তা দেখা যাবার কথা। কোথাও চাঁদ দেখা যায়নি। ফলে সকলে ত্রিশতম রোযা রাখার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেয়। রাতে রেডিও থেকে ঘোষণা হলো যে সীমান্ত প্রদেশের কোন কোন স্থানে চাঁদ দেখা গেছে। অতএব আগামী কাল ঈদ।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বিশিষ্ট কয়েকজন আলেমের সাথে মত বিনিময় করেন। তাঁরা একমত হন যে সীমান্তের কোথাও যদি চাঁদ দেখা গিয়ে থাকে সেখানকার লোক ঈদ করতে পারে কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলে আকাশ সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত থাকায় ও চাঁদ দেখা না যাওয়ায় এই সব অঞ্চলের লোকেরা ঈদ করতে পারেনা। একদিকে সরকারী ঘোষণা, অন্য দিকে বিশিষ্ট আলিমদের অভিমত। ফলে জনগণের একাংশ ঈদ করেন ১২ই জানুয়ারী ও অপরাংশ করেন ১৩ই জানুয়ারী।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ১৩ই জানুয়ারী লাহোরের গুলবাগে অনুষ্ঠিত ঈদের খুতবায় সরকারের ঘোষণার সমালোচনা করেন। সরকারী ঘোষণা সত্ত্বেও দুই দিন ঈদ হওয়ায় প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খান খুবই বিব্রত বোধ করেন।

সরকারের তল্পীবাহক ডঃ ফজলুর রহমান ঘোষণা করেন যে ঈদ সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্ত মানা সকল মুসলিমের ওপর বাধ্যতামূলক এবং সরকারী ঘোষণা সত্ত্বেও যারা ঈদ পালন করেন নি তাঁদের শাস্তি হওয়া উচিত। একদল মৌলিক গণতন্ত্রীও প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খানের সাথে সাক্ষাত করে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানায়।

১৯৬৭ সনের ২৯শে জানুয়ারী সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে গ্রেফতার করে পুলিশ ভ্যানে করে বান্নুতে নিয়ে গিয়ে একটি বাংলোতে আটক করে রাখা হয়। এই ইস্যুতে আরো যেই সব বিশিষ্ট আলিম বন্দী হন তাদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা ইহতিশামুল হক থানবী, মুফতী মুহাম্মাদ হুসাইন নায়িমী, মাওলানা আযহার হুসাইন যায়িদী ও মাওলানা গোলাম গাউস হাজরাবী।

১৯৬৭ সনের ৩রা মার্চ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর পক্ষে মিঃ এ.কে. ব্রোহী, মিঃ আনোয়ার ও মিঃ জাবিদ ইকবাল হাইকোর্টে রীট পিটিশান দায়ের করেন। স্পষ্টত প্রতীয়মান হচ্ছিলো যে মামলার রায় সরকারের বিপক্ষে যাবে। ফলে ১৫ই মার্চ পুলিস ভ্যানে করে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে বান্নুথেকে লাহোরে এনে ছেড়ে দেয়া হয়। সাইয়েদ আবুল আ'লা অর্জন করেন আরেকটি নৈতিক বিজয়।

৬৮. 'পাকিস্তান ডিমোক্রেটিক মুভমেন্ট'

তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খান ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে আবার দূরত্ব সৃষ্টি হয়। প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খান শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রায়নের পথে এগুলেন না। তাঁর শাসনকালের গৌরব-গাঁথা মানুষকে গেলাবার জন্য "উন্নয়ন দশক" পালন করলেন। লাভ কিছুই হলো না। গণ মানুষকে বোকা বানানো গেলোনা। শাসক ও শাসিতের ব্যবধান আরো বেড়ে গেলো।

১৯৬৬ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে শেখ মুজীবুর রহমান তাঁর "ছয় দফার" কপি বিতরণ করেন। তিনি নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হন। তবে তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে "ছয় দফার" প্রতি জন সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালাতে থাকেন।

১৯৬৭ সনের ৩০শে এপ্রিল ঢাকাতে জনাব আতাউর রহমান খানের বাসভবনে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের জনাব নূরুল আমীন, হামিদুল হক চৌধুরী, আতাউর রহমান খান, মুসলিম লীগের মুমতাজ দওলাতানা, তোফাজ্জল আলী, খাজা খায়ের উদ্দীন, জামায়াতে ইসলামীর মিয়া তুফাইল মুহাম্মাদ, মাওলানা আবদুর রহীম, অধ্যাপক গোলাম আযম, আওয়ামী লীগের নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান, আবদুস সালাম খান, গোলাম মুহাম্মাদ খান লুন্দখোর এবং নেজামে ইসলাম পার্টির চৌধুরী

মুহাম্মাদ আলী, মৌলভী ফরিদ আহমাদ ও এম আর খান সূচনা করেন "পাকিস্তান ডিমোক্রেটিক মুভমেন্ট"।

উল্লেখ্য যে "পাকিস্তান ডিমোক্রেটিক মুভমেন্ট" (পিডিএম) গঠন প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও রাজশাহীর মুজীবুর রহমান পরিচালিত আওয়ামী লীগ 'পাকিস্তান ডিমোক্রেটিক মুভমেন্টের' অন্তর্ভুক্ত থাকে। আর শেখ মুজীবুর রহমান ও রাজশাহীর কামারুজ্জামান পরিচালিত আওয়ামী লীগ আলাদাভাবে 'ছয় দফা' ভিত্তিক আন্দোলন চালাতে থাকে।

৬৯. তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সাইয়েদ মওদূদীর ষষ্ঠ সফর

আইউব খান বিরোধী আন্দোলনকে তীব্রতর করার জন্য পিডিএম নেতৃবৃন্দ সারা দেশ সফর করেন। ১৯৬৭ সনের ২৪শে নভেম্বর অন্যান্য নেতাদের সাথে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঢাকা আসেন। তাঁরা ঢাকা ও চট্টগ্রামের জনসভায় পিডিএম এর আট দফা দাবি ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন।

৭০. তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সাইয়েদ মওদূদীর সপ্তম সফর

১৯৬৮ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঢাকা আসেন। অতপর তিনি চৌমুহনী সফর করেন ও এক জনসভায় ভাষণ দেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারী তিনি ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত এক সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। ১লা মার্চ তিনি ইসলামী ছাত্র সংঘের সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন।

৭১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর লন্ডন সফর

বহু বছর আগ থেকেই সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী কিডনীর যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় তিনি চিকিৎসার জন্য লন্ডন যাবার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৬৮ সনের ২৪শে অগাস্ট তিনি করাচী থেকে লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন ও ২৫শে অগাস্ট লন্ডন পৌছেন।

২রা সেপ্টেম্বর তিনি ইউ.কে ইসলামিক মিশনের বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করেন ও দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন।

অতপর তিনি ডাক্তার বেইড নক-এর ক্লিনিকে ভর্তি হন। আনুসঙ্গিক চেক- আপের পর তাঁর মূত্রথলিতে অপারেশন করা হয় ৯ই সেপ্টেম্বর। ২২শে সেপ্টেম্বর বাম কিডনির অপারেশন সম্পন্ন হয়। তিন সপ্তাহ তিনি ক্লিনিকে থাকেন। বেশ কয়েক সপ্তাহ তাঁকে থাকতে হয় লন্ডনে। এই সময় দেশ-বিদেশের বহু ইসলামী ব্যক্তিত্ব তাঁর সাথে সাক্ষাত ও আলাপ করেন। অতপর তিনি দেশে ফিরে আসেন।

৭২. গণ-বিস্ফোরণের মুখে আইউব খানের নতি স্বীকার ও সাইয়েদ আবুল আ'লার দিক নির্দেশনামূলক ভাষণ

বছরের পর বছর ধরে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো আইউব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলো।

১৯৬৮ সনের নভেম্বর মাসে পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্ররা ব্যাপকহারে মাঠে নেমে পড়ে। পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলনের ঢেউ লাগে পূর্ব পাকিস্তানেও।

১৯৬৯ সনের ৭ই জানুয়ারী ঢাকার সকল স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

১৯৬৯ সনের ৭ ও ৮ই জানুয়ারী ঢাকাতে অনুষ্ঠিত মিটিংয়ের পর নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি চৌধুরী মুহাম্মাদ আলী, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের (৮ দফা পন্থী) সভাপতি নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান, জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর মিয়া তুফাইল মুহাম্মাদ, ন্যাশনাল ডিমোক্রেটিক ফ্রন্টের সভাপতি নূরুল আমীন, মুসলিম লীগের সভাপতি মুমতাজ মুহাম্মাদ খান দাওলাতানা, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের (৬ দফা পন্থী) ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সেক্রেটারী জেনারেল মুফতী মাহমুদ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আমীর হুসাইন শাহ নিম্নোক্ত আট দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গঠন করেন 'ডিমোক্রেটিক এ্যাকশান কমিটি (DAC).

আট দফা—

১. ফেডারেল পার্লামেন্টারী সরকার,

২. প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন,

৩. অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার,

৪. নাগরিক স্বাধীনতা পুনর্বহাল ও সকল কালাকানুন বাতিল, বিশেষ করে বিনা বিচারে আটকের আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল,

৫. শেখ মুজীবুর রহমান, খান আবদুল ওয়ালী খান, জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ সকল রাজনৈতিক বন্দী, ছাত্র-শ্রমিক-সাংবাদিক বন্দীদের মুক্তি এবং কোর্ট ও ট্রাইবুনালে দায়েরকৃত মামলা সংক্রান্ত গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার,

৬. ১৪৪ ধারার সকল আদেশ প্রত্যাহার,

৭. শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার বহাল,

৮. নতুন ডিক্লারেশনসহ সংবাদপত্রের উপর আরোপিত সকল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং বাজেয়াপ্ত সকল প্রেস, পত্রিকা ও সাময়িকীর পুনর্বহাল।

৯ই জানুয়ারী লাহোরের ছাত্ররা গণ-মিছিল বের করে। মুলতানের ছাত্রদের ওপর পুলিস হামলা চালায়। ১০ই জানুয়ারী মুলতানের মহিলা কলেজের ছাত্রীরা মিছিলে যোগ দেয়। ১১ই জানুয়ারী রাওয়ালপিন্ডিতে মহিলাদের মিছিল বের হয়।

১২ই জানুয়ারী 'ডিমোক্রেটিক এ্যাকশান কমিটির' ডাকে সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। ঐদিনই অবসরপ্রাপ্ত লেঃ জেনারেল মুহাম্মাদ আযম খান শাসনতন্ত্রের গণতন্ত্রায়নের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। ১৩ই জানুয়ারী অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগার খান বিবৃতি দিয়ে বলেন যে, আইউব সরকারের আর দেশ পরিচালনার অধিকার নেই। ১৭ই জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিস হামলা চালায়। ১৭ ও ১৮ই জানুয়ারী ঢাকা মহানগরী ছাত্রদের মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়। ২০শে জানুয়ারী সরকারী বাহিনীর গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র আসাদুজ্জামান নিহত হয়। ঢাকায় এক বিশাল গণ-মিছিল বের হয়। ২২শে জানুয়ারী রাওয়ালপিন্ডি ও হায়দারাবাদে জনতার ওপর পুলিস লাঠি চার্জ করে। সেই দিন ঢাকায় প্রায় দশ হাজার ছাত্রের বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। ২৭শে জানুয়ারী লাহোর ও করাচীতে সেনাবাহিনী নামিয়ে কারফিউ দেয়া হয়। ২৮শে জানুয়ারী পেশাওয়ার শহর তুলে দেয়া হয় সেনাবাহিনীর হাতে। ৩১শে জানুয়ারী 'ডিমোক্রেটিক এ্যাকশান কমিটির' আহ্বানে সারাদেশে শোক দিবস পালিত হয়।

এইভাবে একের পর এক ঘটতে থাকে ঘটনা। কিছু উগ্রপন্থী গ্রুপ সহিংস কর্মকান্ডও সংঘটিত করে। সরকার দেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। লৌহ-মানব আইউব খান সুস্পষ্ট ভাবে দেখতে পেলেন দেয়ালের লিখন।

১৯৬৯ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারী জুলফিকার আলী ভুট্টোকে মুক্তি দেয়া হয়।

১৯৬৯ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খান জাতির উদ্দেশে এক রেডিও ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন যে তিনি যেই রাজনৈতিক পদ্ধতি চালু করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিলো দেশের স্থিতিশীলতা ও জনগণের সমৃদ্ধি অর্জন। নিজের ক্ষমতা স্থায়ী করার জন্য তিনি এটি করেন নি। যেহেতু জনগণ সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন চায়, তিনি বিষয়টি নিয়ে সকল রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করতে চান। আর, ভুল বুঝাবুঝির অবসানের জন্য তিনি ঘোষণা করেন যে পরবর্তী নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না।

১৯৬৯ সনের ২২শে জানুয়ারী ১৯৬৮ সনের জানুয়ারী মাস থেকে শেখ মুজিবুর রহমানসহ পঁয়ত্রিশ ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।

১৯৬৯ সনের ২২ ফেব্রুয়ারী রাওয়ালপিন্ডিতে এক ছাত্র-সমাবেশে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন যে সামরিক শক্তি বলে ক্ষমতা দখলকারী কোন ব্যক্তিকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করা কঠিন। পাকিস্তানের জনগণকে আল্লাহ্ মহা বিজয় দান করেছেন। তাঁদের কর্তব্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছেন তিনি আর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। ফলে এখন জনগণের ওপর এক বিরাট দায়িত্ব এসে পড়েছে। এখন তাদের কর্তব্য দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা। দেশের নেতৃত্ব প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পরিবর্তন করা ও একটি দায়িত্বশীল পার্লামেন্ট গঠন করা।

ঐ দিন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রাওয়ালপিন্ডিতে জামায়াতে ইসলামীর এক কর্মী সমাবেশেও বক্তব্য রাখেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন "দুনিয়াবাসীকে আমরা জানিয়ে দিতে চাই যে পাকিস্তান ইসলামের দুর্গ। এখানে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আমরা যেমন একনায়কতন্ত্র বরদাশত করবো না, তেমনি বরদাশত করবো না ভিন্ন কোন মতবাদ।"

৭৩. 'রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে' সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

১৯৬৯ সনের ২৬শে ফেব্রুয়ারী রাওয়ালপিন্ডিতে 'রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স' শুরু হয়। এই কনফারেন্সে প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খানের নেতৃত্বে পনর ব্যক্তি, 'ডিমোক্রেটিক এ্যাকশান কমিটির' পক্ষ থেকে নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান, চৌধুরী মুহাম্মাদ আলী, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, অধ্যাপক গোলাম আযম, নূরুল আমীন, মুমতাজ মুহাম্মাদ খান দাওলাতানা, খাজা খায়েরুদ্দিন, মুফতী মাহমুদ, পীর মুহসিনুদ্দিন, আবদুস সালাম খান, মৌলভী ফরিদ আহমদ, খান আবদুল ওয়ালী খান, অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ, হামিদুল হক চৌধুরী, মাহমুদ আলী, শেখ মুজিবুর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ এবং নির্দলীয় অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগার খান ও বিচারপতি এস.এম. মোরশেদ যোগদান করেন। অবসর প্রাপ্ত লেঃ জেঃ মুহাম্মদ আযম খান আমন্ত্রিত ছিলেন। রাওয়ালপিন্ডিতে থাকা সত্ত্বেও তিনি কনফারেন্সে যোগ দেন নি।

পিপলস পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো ও পিকিংপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন।

২৬শে ফেব্রুয়ারী 'রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স' শুরু হলেও ঈদুল আযহার জন্য ১০ই মার্চ পর্যন্ত মুলতবী হয়ে যায়। অতপর ১০ই মার্চ থেকে ১৩ই মার্চ পর্যন্ত বৈঠক চলে।

'ডিমোক্রেটিক এ্যাকশান কমিটির' আহ্বায়ক নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন, ফেডারেল পার্লামেন্টারী সরকার পদ্ধতির প্রবর্তন ও প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে আইন পরিষদের নির্বাচনের দাবি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। শেখ মুজিবুর রহমান আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন, দুই মুদ্রা প্রবর্তন অথবা একই মুদ্রা রেখে প্রত্যেক অঞ্চলে আলাদা রিজার্ভ ব্যাংক স্থাপন, দেশের পররাষ্ট্রনীতির নিরিখে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য নিগোশিয়েট করার ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারগুলোর হাতে অর্পণ, কর ধার্য ও আদায় করার ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারগুলোর হাতে প্রদান ও কেন্দ্রীয় সরকারকে আঞ্চলিক সরকারগুলোর নিকট থেকে কর আদায়ের ক্ষমতা দান, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিল ও সাব-ফেডারেশান গঠন ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখেন।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে, "পাকিস্তান অর্জিত হয়েছিলো ইসলামের নামে, অথচ ইসলামী জীবন বিধান কায়েম করা হয়নি, ফলে এই দেশ অসংখ্য সমস্যার দেশে পরিণত হয়েছে। জন-প্রতিনিধিরা যদি প্রথমে মুসলিম ও পরে অন্য কিছু হতেন তাহলে সংখ্যা সাম্য, আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন ও আনুষঙ্গিক অন্য সব বিষয়ের উদ্ভব ঘটতো না। এমন কি ফেডারেল সরকার পদ্ধতিরও প্রয়োজন হতো না। ইসলামের জীবন পদ্ধতি কায়েম হলে সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদ সৃষ্ট সকল অন্যায় অবিচার বিদূরিত হতো। শাসনতন্ত্রের কয়েকটি সংশোধনী আমাদেরকে বেশিদূর নিয়ে যেতে পারবে না। প্রয়োজন আইনগত, নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক– সামগ্রিক সংস্কার। এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যই আমরা প্রথমে গণতন্ত্রে উত্তরণ চাই। গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও বাক-স্বাধীনতা না থাকলে জনগণকে ইসলামের আলোকে শিক্ষাদান করা কঠিন। যেই সব সমস্যা সমাজকে জর্জরিত করছে তার সমাধান একদিনে সম্ভব নয়। এর জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। এই জন্য প্রথমে চাই প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরাসরি নির্বাচন ও ফেডারেল পার্লামেন্টারী সরকার পদ্ধতির প্রবর্তন।"

প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খান ১৩ই মার্চ 'রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের' সমাপ্তি কালে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচন ও ফেডারেল পার্লামেন্টারী সরকার প্রবর্তনের দাবি মেনে নেয়ার ঘোষণা দেন।

'রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের' পর 'ডিমোক্রেটিক এ্যাকশান কমিটি' প্রেসিডেন্টের ঘোষণা বিবেচনা করার জন্য মিটিং করে। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ছয় দফা সমর্থন না করায় পূর্বাহ্নেই 'ডিমোক্রেটিক এ্যাকশান কমিটির' সাথে সম্পর্ক ছিন্ন

করেন। মস্কোপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রতিনিধি 'ডিমোক্রেটিক এ্যাকশান কমিটির' মিটিংয়ে যোগ দেননি।
আন্দোলনের লক্ষ্য অর্জিত হওয়ায় 'ডিমোক্রেটিক এ্যাকশান কমিটির' বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়।

৭৪. উগ্রপন্থীদের অপ-রাজনীতি

একতান্ত্রিক শাসন থেকে গণতান্ত্রিক শাসনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো দেশ। উগ্রপন্থীরা এই উজ্জ্বল সম্ভাবনা বিনাশ করে দেয়।

দেশের সর্বত্র ঘেরাও আন্দোলন চলতে থাকে। চলতে থাকে জ্বালাও পোড়াও অভিযান। হত্যা, আগুন লাগানো, নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সেক্রেটারিয়েটে হরতাল, ছাত্রদের হরতাল, শিক্ষকদের হরতাল ও শ্রমিকদের হরতাল চলতে থাকে। ভিন্ন মতাবলম্বী রাজনীতিবিদদের ওপর হামলা চালানো হয়। আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে। প্রশাসন ভেংগে পড়ে। সর্বত্র ত্রাস ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দেশে কোন সরকার আছে বলে মনে হচ্ছিলো না।

৭৫. আবার অ-সাংবিধানিক শাসনের কবলে পাকিস্তান

এই নাজুক অবস্থায় প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খান দেশে সামরিক শাসন জারি করতে চান। সেনা প্রধান জেনারেল আগা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া খান তাঁকে জানিয়ে দেন যে সামরিক শাসন জারি করতে হলে তা করবে সেনাবাহিনী। এই কথার অর্থ বুঝতে প্রেসিডেন্টের কষ্ট হয়নি। ১৯৬৯ সনের ২৪শে মার্চ প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খান এক চিঠির মাধ্যমে সেনা প্রধানকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করার অনুরোধ জানান।

১৯৬৯ সনের ২৫শে মার্চ সন্ধা সোয়া সাতটায় জেনারেল আগা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া খান দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি শাসনতন্ত্র বাতিল করেন। জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদগুলো ভেংগে দেন। প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। ৩১শে মার্চের এক ঘোষণা অনুযায়ী চীফ মার্শাল ল এডমিনিষ্ট্রেটর জেনারেল আগা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া খান ২৫শে মার্চ সন্ধা সোয়া সাতটা থেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভারও হাতে তুলে নেন। এইভাবে তিনি হন পাকিস্তানের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট।

৭৬. সাইয়েদ আবুল আ'লার তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে অষ্টম সফর

১৯৬৯ সনের ১৪ই জুন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঢাকা আসেন। ১৫ই জুন ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত এক সীরাত সম্মেলনে তিনি বক্তব্য রাখেন। দুই সপ্তাহ সফর করে তিনি লাহোর ফিরেন।

৭৭. মরক্কোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে যোগদান

১৯৬৯ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে এয়ার ফ্রান্সের প্লেনে চড়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী প্যারিস রওয়ানা হন। প্যারিস থেকে মরক্কো এয়ার লাইনসের প্লেনে করে তিনি ১৪ই সেপ্টেম্বর রাবাত পৌছেন। রাতে রাবাতে অবস্থান করে তিনি ১৫ই সেপ্টেম্বর ফাস পৌছেন। এখানেই অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলন।

সাইয়েদ আবুল আ'লা খুবই অসুস্থ ছিলেন। তিনি এই সম্মেলনে যেতে চাননি। কিন্তু মরক্কোর শিক্ষামন্ত্রী তাঁকে অনুরোধ জানান। অগত্যা তিনি সফরের প্রস্তুতি নেন। তাঁর সফরসংগী ছিলেন খলীল আহমাদ হামিদী।

আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো কাইরোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে। এই কাইরোয়ান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো নবম শতাব্দীতে। অর্থাৎ এগার শত বছর আগে।

এই সম্মেলনে ২০টি দেশের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদরা যোগদান করেন। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় উন্নত মানের স্কলার তৈরি করতে হবে যারা হবে মূলত নিষ্ঠাবান মুসলিম। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধ সম্পৃক্ত করতে হবে, বিদ্বেষবশত পশ্চিমের প্রাচ্যবিদরা ইসলামের যেই বিকৃত রূপ পেশ করেছে তার মুকাবিলায় ইসলামের আসল রূপ তুলে ধরতে হবে এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য মুসলিম দেশগুলো থেকে যেই সব ছাত্র পশ্চিমের দেশগুলোতে যায় তাদেরকে ইসলামবিরোধী চিন্তাধারা থেকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭৮. প্রথম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান

১৯৬৯ সনের ২২শে সেপ্টেম্বর মরক্কোর রাজধানী রাবাতে দুনিয়ার মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধান/সরকার প্রধানদের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সন্দেহ নেই, এটি ছিলো বিশ শতকের মুসলিম উম্মাহর জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। ইরাক ও সিরিয়া ছাড়া বাকি মুসলিম দেশগুলো এই সম্মেলনে অংশ নেয়।

আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে যোগদানের জন্য বিশটি দেশের যেই সব প্রখ্যাত ব্যক্তি মরক্কো এসেছিলেন শীর্ষ সম্মেলনে তাঁদেরকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীও এই সম্মান লাভ করেন। তবে স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে তিনি শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশন ছাড়া আর কোন অধিবেশনে থাকতে পারেননি।

মরক্কো থেকে তিনি লন্ডন পৌঁছেন ২৩শে সেপ্টেম্বর। ২৪শে সেপ্টেম্বর তিনি ইস্ট লন্ডন মাসজিদে সমবেত মুছাল্লীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন।

লন্ডনে অবস্থানকালে তাঁর মেডিকেল চেক-আপ সম্পন্ন হয়। তিনি ২৭শে সেপ্টেম্বর লন্ডন থেকে রওয়ানা হয়ে ২৮শে সেপ্টেম্বর করাচী পৌঁছেন। সেখান থেকে রাতে পৌঁছেন লাহোর।

২৯শে সেপ্টেম্বর তিনি লাহোরে একটি প্রেস কনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন। এতে তিনি আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এবং বলেন যে শিক্ষা সম্মেলনের প্রধান প্রস্তাবে মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে যদি নিয়মিতভাবে এই শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে থাকে তাহলে এক সময় তা 'মুসলিম ইউনাইটেড নেশানসে' পরিণত হতে পারে।

৭৯. সাউদী আরবে সর্বশেষ সফর

১৯৬৯ সনের অকটোবর মাসে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রাবিতাতুল-আলম-আল ইসলামীর মিটিংয়ে যোগদান করার জন্য সাউদী আরব আসেন। মিটিংয়ে যোগদান, বিভিন্ন ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত, মাক্কা ও মাদীনায় পালনীয় কাজগুলো সম্পন্ন করে তিনি দেশে ফিরেন ৩১শে অকটোবর।

৮০. তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সাইয়েদ আবুল আ'লার নবম সফর

ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট আগা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া খান ঘোষণা করেন যে ১৯৭০ সনের অকটোবর মাসে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৭০ সনের পহেলা জানুয়ারী প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়। ৪ঠা জানুয়ারী এক বিবৃতির মাধ্যমে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সরকারের এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করেন।

১৯৭০ সনের ১৭ই জানুয়ারী সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঢাকা পৌঁছেন। ১৮ই জানুয়ারী পল্টন ময়দানে তাঁর বক্তৃতা করার কথা। যথাসময়ে জামায়াতে ইসলামীর স্থানীয় নেতৃবৃন্দ জনসভার কাজ শুরু করেন। ইসলাম' বিদ্বেষী একটি রাজনৈতিক দল এই জনসভা পন্ড করার সিদ্ধান্ত নেয়। লাঠি হাতে ও ইট পাটকেল নিয়ে গ্রুপে গ্রুপে সেই দলের কর্মীরা বিভিন্ন দিক থেকে পল্টন ময়দানে ঢুকে জনসভার ওপর হামলা চালায়। জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরা এই হামলা ঠেকাবার চেষ্টা করে। দীর্ঘ সময় ধরে চলে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। একের পর এক আহত হতে থাকে

জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরা। আহতের সংখ্যা পাঁচশত ছাড়িয়ে যায়। দুইজন ছাত্র শাহাদাতবরণ করেন। ঢাকার জিলা প্রশাসক ছিলেন একজন কাদিয়ানী। তিনি পুলিস পাঠালেন বটে। তারা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। লাঠিধারীরা জনসভা ভেংগে দিতে সক্ষম হওয়ার পর পুলিসকে সক্রিয় হতে দেখা গেছে। নির্দিষ্ট সময়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী পল্টন ময়দানের গেটে পৌছেন। অবস্থার নাজুকতা লক্ষ্য করে ড্রাইভার তাঁকে তাঁর অবস্থান স্থলে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ২১শে জানুয়ারী তিনি করাচী পৌছেন।

৮১. তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সাইয়েদ আবুল আ'লার দশম ও সর্বশেষ সফর

১৯৭০ সনের ২৮শে জুন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী দশম বারের মতো তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন। এটাই ছিলো পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর সর্বশেষ সফর। এই সফরে এসে আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য নমিনি তালিকা চূড়ান্ত করতে তিনি পার্লামেন্টারী বোর্ডের মিটিংয়ে যোগ দেন। ঢাকার এক কর্মী সমাবেশেও তিনি বক্তব্য রাখেন। ৩রা জুলাই তিনি লাহোর ফিরে যান।

৮২. সাইয়েদ মওদূদীকে হত্যার উদ্যোগ

সারগোদা জিলার জাওহারাবাদে সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন কয়েকজন আলিম এক জনসভায় সাইয়েদ আবুল আ'লার বিরুদ্ধে বিষোদগার করে বক্তৃতা করেন। তাঁরা তাঁকে সাহাবীদের শান বিনষ্টকারী হিসেবে আখ্যায়িত করে শ্রোতাদেরকে তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে তোলার চেষ্টা চালান। তাঁদের বক্তব্য সত্য মনে করে জাওহারাবাদের এক যুবক খুবই বিক্ষুব্ধ হয়। সে সিদ্ধান্ত নেয় যে সাইয়েদ আবুল আ'লাকে হত্যা করতে হবে।

সেই যুবকের নাম ছিলো জাহিদ ইকবাল। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সে জাওহারাবাদ থেকে লাহোর আসে। সে সাথে নিয়ে আসে একটি ধারালো ছোরা। সে যখন ৫-এ যাইলদার পার্কে পৌছে তখন সালাতুল আছরের সময় হয়ে গেছে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বাসা থেকে বেরিয়ে এসে সালাতুল আছরের ইমামত করেন। জাহিদ ইকবালও জামায়াতে শরিক হয়। সালাতুল আছরের পর সাইয়েদ আবুল আ'লা বাড়ির চত্বরে সাজানো অনেকগুলো চেয়ারের একটিতে বসে পড়েন। অন্যরা চেয়ার নিয়ে তাঁকে ঘিরে বসে পড়ে।

জাহিদ ইকবাল সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর পেছনে দাঁড়িয়ে তার লুক্কায়িত ছোরার বাঁট চেপে ধরে। এমন সময় তার দৃষ্টি পড়ে সাইয়েদের পূর্ণ চেহারার ওপর। তার মনে খানিকটা ভাবান্তর সৃষ্টি হয়। সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত

নেয়। শ্রোতাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, "সমাজতন্ত্রী গ্রুপের আলিমরা আপনাকে গালমন্দ করে, আপনি কেন তাদের জওয়াব দেন না?" সাইয়েদ আবুল আ'লা উত্তর দেন, "শেষাবধি সত্যই বিজয়ী হয়, আমি যা লিখেছি তার পক্ষে যুক্তি প্রমাণও পেশ করেছি। গালির বদলে পালি দেয়া ইসলামের বিধান নয়। এবং জনগণ তাদের বিবেক ব্যবহার করে দেখবে সত্য কোথায় অবস্থান করছে।" এই সব কথা শুনার পর জাহিদ ইকবালের বিবেক জেগে উঠে। সে অনুভব করতে শুরু করে যে সত্য তো এখানে। তাঁকে যারা গালমন্দ করছেন তাঁরাই মিথ্যাচারী।

হঠাৎ জাহিদ ইকবাল বসে পড়ে সাইয়েদ আবুল আ'লার পা জড়িয়ে ধরে। সাইয়েদ মওদূদী তাকে টেনে তুলে সে এমনটি করছে কেন জানতে চান। জাহিদ ইকবাল বললো, "আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে হত্যা করতে এসেছিলাম।" সাইয়েদ মওদূদী বললেন, "এই তো আমি, তুমি তোমার কর্তব্য পালন করতে পার।"

কয়েকজন লোক ছুটে আসেন জাহিদ ইকবালকে পাকড়াও করতে। সাইয়েদ আবুল আ'লা তাঁদেরকে থামিয়ে দেন। জাহিদ ইকবালের বিমর্ষ চেহারার দিকে তাকিয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা বললেন, "মনে হচ্ছে তুমি দুপুরের খাওয়া খাওনি।" তার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হলো। জাহিদ ইকবাল এসেছিলো সাইয়েদ আবুল আ'লাকে হত্যা করতে। সত্যের সাথে পরিচিতি হয়ে সে শামিল হয় সাইয়েদ আবুল আ'লার সহকর্মীদের কাতারে।

৮৩. ১৯৭০ সনের নির্বাচনী মেনিফেস্টো ঘোষণা

১৯৭০ সনের সাধারণ নির্বাচনের আগে শেখ মুজীবুর রহমান তাঁর ছয় দফার প্রতি সমর্থন আদায়ের জন্য পূর্ব পাকিস্তান চষে বেড়াতে থাকেন। মস্কোপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির খান আবদুল ওয়ালী খান ও অধ্যাপক মুযাফফর আহমাদ 'সমাজতন্ত্রের' পক্ষে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা চালাতে থাকেন। পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো জোরেসোরে বলতে লাগলেন যে পাকিস্তানে 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' কায়েম করতে হবে। পিকিং পন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীও আওয়াজ তুললেন যে পাকিস্তানে 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' কায়েম করতে হবে। মাওলানা ভাসানী নির্বাচন বয়কট করে জনগণের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানালেন, "তোমরা যদি বাঁচতে চাও হাতিয়ার হাতে তুলে নাও।" সরদার আবদুল কাইউম খান, মিয়া মুমতাজ মুহাম্মাদ খান দাওলাতানা প্রমুখ মুসলিম জাতীয়তাবাদের পতাকাবাহী রূপে প্রচার কাজ

চালাতে থাকেন। সাইয়েদ আবুল আ'লার নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানকে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালাতে থাকে। নির্বাচনের পূর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকে রেডিও ও টেলিভিশনে বক্তৃতা করার সুযোগ দেয়া হয়। ১৯৭০ সনের ৩রা নভেম্বর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী মেনিফেস্টো জনগণের সামনে পেশ করেন।

৮৪. তাফসীর তাফহীমুল কুরআন সমাপ্তকরণ

লেখার জগতে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর শ্রেষ্ঠ অবদান তাফসীর তাফহীমুল কুরআন। তিনি ইসলামী দাওয়াতের গাইড বুক আল কুরআনের তাফসীর প্রাঞ্জল ভাষায় তথ্য সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় রূপে উপস্থাপন করেন। তাফসীর তাফহীমুল কুরআন তাঁর ত্রিশ বছরের অধ্যয়ন ও গবেষণার ফসল। প্রধানত ভবিষ্যত জেনারেশানকে সামনে নিয়েই তিনি এই তাফসীর লিখেন। তিনি বলতেন, "তাফহীমুল কুরআন লেখার কাজ আমার ওপর ভবিষ্যত প্রজন্মের হক বলে মনে করি।"

তিনি ১৯৪৩ মনে এই তাফসীর লেখার কাজ শুরু করেন। শেষ করেন ১৯৭২ সনে।

৮৫. আমীর পদ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর স্বাস্থ্যের অবস্থা ক্রমশই অবনতির দিকে যেতে থাকে। আমীর হিসেবে বহুমুখী কার্যক্রমে অংশ নেয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। ১৯৭২ সনে তিনি আমীর পদ থেকে অব্যাহতি নেন। ১৯৭২ সনের ২রা নভেম্বর মিয়া তুফাইল মুহাম্মাদ জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আমীর নির্বাচিত হন।

৮৬. দ্বিতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে মেমোরেন্ডাম পেশ

১৯৭১ সনে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হওয়ার পর পাকিস্তানের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট আগা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া খান পদত্যাগ করেন এবং পাকিস্তানের চতুর্থ প্রেসিডেন্ট হন জুলফিকার আলী ভুট্টো।

১৯৭৩ সনে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে বড়ো রকমের পরিবর্তন আনা হয়। এর অধীনে চৌধুরী ফজলে ইলাহী পাকিস্তানের পঞ্চম প্রেসিডেন্ট ও জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী হন।

১৯৭৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন। মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধান/ সরকার প্রধানগণ এই সম্মেলনে

যোগ দান করেন। এই শীর্ষ সম্মেলনে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী একটি মেমোরেন্ডাম পেশ করেন। এই মেমোরেন্ডামে তিনি যেইসব বিষয়ের প্রতি দুনিয়ার মুসলিম নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সেইগুলো হচ্ছে–

১. মুসলিম দেশগুলোর সম্মিলিতভাবে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা উদ্ভাবন।
২. মুসলিম দেশগুলোতে আরবী ভাষাকে কমন আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ।
৩. সমরাস্ত্র উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।
৪. মুসলিম দেশগুলোর পারস্পরিক বিরোধ নিজেরাই মেটানো।
৫. মুসলিম দেশগুলো মিলে একটি কমন নিউজ এজেন্সী গঠন।
৬. মুসলিম দেশগুলোতে মুসলিমদের সহজ গমনাগমনের জন্য ভিসার কড়াকড়ি কমানো।
৭. আফ্রিকার মুসলিমদের খৃস্টানদের কর্তৃত্বমুক্ত হওয়ার প্রয়াসের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন।
৮. অ-মুসলিম দেশগুলোর মুসলিম নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৯. পশ্চিমা দেশগুলোতে অধ্যয়নরত মুসলিম ছাত্রদের জন্য নিজস্ব ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করণ।
১০. শক্তিশালী রেডিও ষ্টেশান স্থাপন করে মুসলিম স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম উপস্থাপন।
১১. মুসলিমদের একটি আন্তর্জাতিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা।
১২. ফিলিস্তিন ও কাশ্মীরের মুসলিমদের প্রতি বলিষ্ঠ সমর্থন প্রদান।

এই মেমোরেন্ডাম সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর গভীর চিন্তা, সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির সাক্ষ্য বহন করে।

৮৭. ইউনাইটেড ষ্টেটস অব আমেরিকাতে প্রথম সফর

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর দ্বিতীয় ছেলে ডাঃ আহমাদ ফারুক মওদূদী ইউনাইটেড ষ্টেটস অব আমেরিকার বাফেলো সিটিতে কর্মরত ছিলেন। তাঁর অনুরোধে চিকিৎসার জন্য সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সেখানে যেতে সম্মত হন।

১৯৭৪ সনের এপ্রিল মাসে তিনি সস্ত্রীক বাফেলো পৌঁছেন। চিকিৎসার ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন ইসলামী ব্যক্তিদের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত ও গ্রুপ ভিত্তিক সাক্ষাত ও আলাপ চলতে থাকে। কানাডার টরোন্টোতেও তাঁকে যেতে হয়। সেখানে মুসলিমদের একটি সম্মেলনে তিনি বক্তব্য রাখেন। কয়েক মাস ইউনাইটেড ষ্টেটস অব আমেরিকাতে অবস্থানের পর তিনি দেশে ফিরেন।

৮৮. পাকিস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চে জেনারেল মুহাম্মাদ জিয়াউল হকের আগমন

গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হলেও প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর সরকার জনগণের ওপর ডিকটেটোরিয়াল শাসন চালাতে থাকে। এতে জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো জোটবদ্ধ হয়ে ভুট্টো সরকারের বিরোধিতা করতে থাকে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে সমঝোতা না করে মিঃ ভুট্টো দমন নীতি চালাতে থাকেন। দেশ দারুণভাবে অশান্ত হয়ে উঠে।

এই প্রেক্ষাপটে ১৯৭৭ সনের ৪ঠা জুলাই সেনাপ্রধান জেনারেল মুহাম্মাদ জিয়াউল হক ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৭৭ সনের ১৬ই সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট চৌধুরী ফজলে ইলাহী পদত্যাগ করেন। পাকিস্তানের ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন জেনারেল মুহাম্মাদ জিয়াউল হক। তিনি ঘোষণা করেন যে পাকিস্তান ইসলামের নামে অর্জিত হয়েছে, অতএব তিনি ইসলামী বিধান প্রবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৮৯. সাইয়েদ আবুল আ'লার কিং ফায়সাল এয়োওয়ার্ড লাভ

১৯৭৯ সনে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী কিং ফায়সাল এয়োওয়ার্ডে ভূষিত হন। এটি ছিলো তাঁকে প্রদত্ত অনন্য সম্মান। পুরস্কার হিসেবে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ তিনি ইসলামী গবেষণা কাজে ব্যয় করার জন্য দান করে দেন।

৯০. ইন্তিকাল

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী হাঁটু ও কোমরের ব্যথায় ভুগছিলেন। আরো ভুগছিলেন পেটের ব্যথায়।

১৯৭৯ সনের মধ্যভাগে ডাঃ আহমাদ ফারুক মওদূদী দেশে এসে তাঁর আব্বাকে চিকিৎসার জন্য ইউনাইটেড ষ্টেটস অব আমেরিকাতে যেতে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। অবশেষে সাইয়েদ আবুল আ'লা তাঁর স্ত্রীসহ ছেলের সাথে আমেরিকা পৌছেন। ২০শে অগাস্ট বাফেলোর একটি হাসপাতালে তাঁর মেডিকেল চেক আপ শুরু হয়। ৪ঠা সেপ্টেম্বর তাঁর পেটের আলসার অপারেশান করা হয়। তিনি বেশ সুস্থ হয়ে উঠছিলেন।

৬ই সেপ্টেম্বর হঠাৎ তাঁর হার্ট এটাক হয়। তাঁকে মিলার ফ্লাওয়ার হসপিটালে স্থানান্তরিত করা হয়। পরবর্তী দুই সপ্তাহে তিনি বেশ কয়েকবার হার্ট এটাকের সম্মুখীন হন। ক্রমশ তাঁর জীবনী শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসে।

১৯৭৯ সনের ২২শে সেপ্টেম্বর সকালে তিনি ইন্তিকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭৬ বছর।

তাঁর ইন্তিকালের খবর পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। দুনিয়ার ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীরা তাঁদের মনের গভীরে দারুণ শূন্যতা অনুভব করেন। প্রাণ ভরে তাঁরা তাঁর জন্য দুআ করতে থাকেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সমীপে।

বাফেলোতে তিনবার জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। একটি চার্টার্ড বিমানে করে তাঁর লাশ আনা হয় নিউইয়র্ক। কেনেডী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। প্যান এমেরিকান এয়ার লাইনসের বিমানে করে নিউইয়র্ক থেকে লাশ লন্ডনের হিথ্রো এয়ারপোর্টে আনা হয়। এখানেও অনুষ্ঠিত হয় জানাযার নামায। অতপর ২৬শে সেপ্টেম্বর পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইনসের একটি বিমানে করে তাঁর লাশ আনা হয় পাকিস্তানের করাচী এয়ারপোর্টে। এখানেও জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিনই বিকেলে লাশ পৌঁছে লাহোর। সাত মাইল লম্বা মিছিলের সাথে লাশ পৌঁছে গন্তব্যস্থলে।

২৬শে সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় পাকিস্তানের বৃহত্তম ষ্টেডিয়াম লাহোরের গাদাফী ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় সর্বশেষ জানাযা। জানাযার নামাযে শরীক হওয়ার জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মুহাম্মাদ জিয়াউল হক বিমানযোগে রাওয়ালপিন্ডি থেকে লাহোর পৌঁছেন। মাক্কার মাসজিদুল হারামের ইমাম শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন সুবাইল গাদাফী ষ্টেডিয়ামে জানাযার নামাযে ইমামত করার কথা ছিলো। অনিবার্যকারণে তাঁর যাত্রা বিলম্বিত হয়। ফলে কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ইউসুফ আবদুল্লাহ আল কারদাভী ইমামত করেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মুহাম্মাদ জিয়াউল হক ছাড়াও জানাযায় অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন সাউদী আরবের রাষ্ট্রদূত, জর্দানের রাষ্ট্রদূত, ইরানের স্বরাষ্ট্র সচিব, ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ-এর অন্যতম নেতা ডঃ আহমাদ তুতুনজী, সিরিয়ার সেরা ইসলামী চিন্তাবিদ শায়খ সাঈদ হাওয়া ও শায়খ আদনান সা'দুদ্দীন, কুয়েতের শায়খ আবদুল্লাহ আল আকীল, শায়খ মুবারাক ও শায়খ আবদুল আযীয আলী আল মুতাওয়া, মিসরের ডঃ কামাল ও শায়খ হাসানুল বান্নার পুত্র সাইফুল ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী হিন্দের আমীর মাওলানা ইউসুফ, পাকিস্তানের বিশিষ্ট আলিম মুফতী মাহমুদ, রাজনীতিবিদ নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান, সরদার শাওকাত হায়াত খান, চৌধুরী জহুর ইলাহী, খাজা খাইরুদ্দীন, আল্লামা ইহসান ইলাহী জহীর প্রমুখ, আযাদ কাশ্মীরের সাবেক প্রেসিডেন্ট সরদার আবদুল কাইউম

খান এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান। প্রায় তিন লাখ লোক জানাযায় শরীক হন।

৫-এ যাইলদার পার্কে সাইয়েদ আবুল আ'লার বাসগৃহের সম্মুখস্থ সবুজ চত্বরের একটি কোণে তাঁকে দাফন করা হয়।

৯১. উপসংহার

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু মৃত্যু ঘটেনি তাঁর চিন্তাধারার। ইসলামী আন্দোলনের যেই জোয়ার তিনি সৃষ্টি করে গেছেন তা দুর্বার বেগে এগিয়ে যাচ্ছে সামনে। তাঁর বিজ্ঞান-সম্মত সাংগঠনিক দিক-নির্দেশনা ইসলামী আন্দোলনকে উত্তরোত্তর শক্তিধর করে তুলছে।

সমাপ্ত

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা